বিভ্রান্তির বেড়াজালে মুসলিম সমাজ

শায়খ আব্দুল হামীদ ফাইযী

আব্দুল হামীদ মাদানী

১৬/৩/১৪৩১, ২/৩/১০

[إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ]

سورة هود (٨٨)

(আমি তো আমার সাধ্যমত সংশোধন করারই ইচ্ছা পোষণ করি। আর আমার কৃতকার্যতা তো শুধু আল্লাহরই সাহায্যে; আমি তাঁরই উপর ভরসা রাখি এবং আমি তাঁরই অভিমুখী। ---সূরা হূদ ৮৮ আয়াত)

সূচীপত্র

শুরুর কথা

হাতে এল একখানি পুস্তিকা। নাম---'তত্ত্ব ও বাস্তবের ভ্রান্তি আজকের ইসলাম'। লেখক---মহম্মদ নূর আলম। নিবাস---কীর্ণাহার, বীরভূম। পুস্তিকাটি বিতর্কিত। পুস্তিকার নামটিও ভ্রান্তিমূলক। 'ইসলাম' আবার আজ-কাল-পরশুর ইসলাম হয় নাকি? ইসলাম তো চিরকালের। কালে কালে ইসলামকে খণ্ডিত করা যায় না।

বইটির লেখক নূর আলম সাহেব 'তত্ত্ব ও বাস্তবের ভ্রান্তি' প্রমাণ ক'রে 'আজকের ইসলাম'কে কলুষিত করেছেন। আসলে তাঁর লেখাতেই রয়েছে বিভ্রান্তিকর তত্ত্ব, আসলেই তাঁর আলমে ও কলমে কোন হিদায়াতের নূর নেই।

বলা বাহুল্য, উক্ত পুস্তিকারই জবাব-স্বরূপ আমার এই 'বিভ্রান্তির বেড়াজালে মুসলিম সমাজ'।

ইসলাম যুক্তির ধর্ম। অবশ্যই। তবে দলীলের উপর যুক্তি খাটে না। যখন কোন জিনিসের দলীল না পাওয়া যায়, তখনই যিনি যেমন, তিনি তেমন যুক্তি দেখিয়ে সমস্যার সমাধান দিয়ে থাকেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, অনেক মানুষ আছেন, যাঁরা বড় শয্যাবিলাসীর মত শুয়ে বলে দিতে পারেন, সাত-পুরু বিছানার কোন ফাঁকে চুল আছে! তাঁরা বড় ভোজনবিলাসীর মত খেতে খেতে বলে দিতে পারেন, ভাতের চালের ধান শ্মশানের ধারের জমির! তাঁরা কুরআন-হাদীসের উপরেও যুক্তি খাটান। হাদীসের শব্দ বা অনুবাদ পড়েই বলে দেন, সেটা হাদীস কি না!

তাঁরা নিজেদের বিবেক-বুদ্ধি নিয়ে গর্বিত। তাঁরা কুরআন-হাদীসের উলামার প্রতি আস্থাশীল নন, শ্রদ্ধাশীল নন। তাঁরা বই পড়েন এবং সেখান থেকে জ্ঞান আহরণ করেন। আর তার ফলে যা পড়েন এবং তাঁদের মনে যা ভাল মনে হয়, তাই মনের মণিকোঠায় স্থান দিয়ে থাকেন। প্রেমের আকর্ষণে প্রথমে যেই এসে যায়, সেই প্রেমিকের চোখে বিশ্বসুন্দরী হয়। সে অসুন্দরী হলেও অন্য সকলকে সুন্দরী লাগে না। আরবী কবি বলেছেন,

أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى ... فصادف قلباً خالياً فتمكنا

অর্থাৎ, প্রেম জানার পূর্বে তার প্রেম আমার কাছে এল। অতঃপর শূন্য অন্তর পেয়ে স্থান ক'রে নিল।

মাআরিফুল কুরআনে নবী-অলীর বরাত দিয়ে দুআ বৈধ করা হয়েছে। সেই কারণে এবং অন্যান্য আরো অনেক কারণে সঊদী আরবে ছেপে বিতরণের পর তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

মওলানা আকরাম খাঁর 'মোস্তফা চরিত' ও তাঁর তফসীরে সহীহ হাদীসকে অস্বীকার ক'রে বহু মু'জিযা অস্বীকার করা হয়েছে। আপনি আপনার সত্যানুসন্ধিৎসার প্রথম দিকে পড়লে তা আপনার মনে-মগজে অবশ্যই স্থান পেয়ে যাবে। পিপাসার প্রথম পানে যে পানি পান করবেন, সেটাই ভাল লাগবে। এটাই স্বাভাবিক।

বিনা গাইডে কেবল বই পড়ে সঠিক জ্ঞান লাভ করা যায় না; যখন জানা না যাবে যে, যা পড়া হচ্ছে, তা সঠিক কি না।

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি শুধুমাত্র কিতাবের উদর হতে জ্ঞান অন্বেষণ করবে (ও শরয়ী আলেম হতে চাইবে) সে সমস্ত আহকামকে ধ্বংস ক'রে ফেলবে।'

তাঁদের কেউ কেউ বলতেন, 'দ্বীনের জন্য বড় আপদ তারা, যারা কিতাব-পত্রকে নিজেদের শায়খ বা ওস্তাদ বানিয়ে আলেম হয়।' *(তাযকেরাতুস সা-মে' অল মুতাকাল্লিম ৮-৭পৃঃ)*

যেমন পূর্বে বলা হত যে, 'কিতাবই যার ওস্তাদ হয়, তার ঠিকের চেয়ে ভুলের ভাগই বেশী হয়।'

আবূ হাইয়ান নহবী বলেন, 'অনেক অবুঝ লোকের ধারণা যে, কেবল মাত্র বই-পত্র পড়েই ইল্ম (জ্ঞান) অর্জন করা যায় এবং ইচ্ছা করলে সবকিছু বোঝা যায়। কিন্তু জাহেল জানে না যে, তার মধ্যে এমন বাক্য ও কথা থাকবে, যা তার বোধগম্য নয় বা সহজে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। তাই যদি তুমি বিনা ওস্তাদে ইল্ম লাভ করার আশা রাখ, তবে সঠিক পথ হতে অবশ্যই ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। আর সমস্ত বিষয় তোমার মস্তিস্কে তালগোল পাকিয়ে তুলবে এবং ধর্মের পথে অধিক ভ্রান্ত হবে তুমিই।' (যেহেতু নিম-হাকীমে জানের খতরা এবং নিম-আলেমে ঈমানের খতরা থাকে। আর অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী।)

ইবনে বাত্তাল বলেছেন, 'কিতাবে এমন কতক ভ্রান্তকর (সন্দিগ্ধ) জিনিস থাকে, যার কারণে মূল বক্তব্য স্পষ্টভাবে বুঝা যায় না। কোন আলেম বা ওস্তাদের নিকট পড়লে তা ধরা পড়ে বা সে ভ্রান্তি হয় না। যেমন, মুদ্রাকর-প্রমাদ বা ছাপায় ভুল, দৃষ্টি-প্রমাদে পড়ায় ভুল, এ'রাব (আরবীতে কোথায় জের, জবর বা পেশ হবে তার) ভুল, (এই ভুলে কর্তাকে কর্মকারক এবং মানুষকে পশু বানিয়ে দেওয়া হয় এবং এইমত আরো কতশত ভুল হয়ে থাকে এই এ'রাব না জানার কারণে।) বিরাম বা থামার স্থান না জানায় ভুল, (বিশেষ করে সেই সব কিতাবে যাতে যতিচিহ্ন ব্যবহৃত হয়নি।) পুস্তকের পরিভাষা না জানায় ভুল, (নাসেখ-মানসূখ, সহীহ-যয়ীফ, আদেশ-উপদেশ প্রভৃতি না জানার প্রমাদ) ইত্যাদি।' *(শারহু ইহয়্যায়ি উলুমিদ্দীন ১/৬৬)*

উদাহরণ স্বরূপ এক তালেবে ইল্ম পড়েছিল,

المؤمن كيس فطن.

আল-মু'মিনু কীসু কুত্বন। অর্থাৎ, মু'মিন ব্যক্তি একটি তুলোর ব্যাগ! আসলে তা ছিল, 'আল-মু'মিনু কাইয়িসুন ফাত্বিন।' অর্থাৎ, মু'মিন হয় বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী।

ডাক্তারের বিনা পরামর্শে কেবল বই পড়ে ওষুধ ব্যবহার করলে যেমন অনেক সময় বিপদে পড়তে হয়, ঠিক তেমনিই কোন ওস্তাদ বিনা কেবল বই পড়ে আলেম হতে চাইলে একই অবস্থা হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

এ প্রসঙ্গে পুঁথিগত পন্ডিতের গল্প মনে পড়ে। তিনি কেবল পুঁথি পড়ে ঘরে বসে পন্ডিত হয়েছিলেন। জীবন-চলার পথে সর্বদা নিজের কাছে পুঁথিও রাখতেন। একদা এক সফরে তিনি পথ ভুলে গেলেন। পথের দিশা পেতে পুঁথি খুলে পড়তে পড়তে এক জায়গায় দেখলেন লেখা আছে,

'বহুজন যায় যেদিকে,
পথ তারে কয় সর্বলোকে।'

মনে মনে খুশী হয়ে যেন পথের দিশা ফিরে পেলেন। কিছুক্ষণ পর দেখলেন অদূরে একদল লোক হেঁটে যাচ্ছে। পন্ডিতজী তাদের পিছু ধরলেন এবং ভাবলেন, এটাই তার বাঞ্ছিত পথ। কিন্তু কিছুদূর গিয়ে দেখলেন, লোকগুলি এক দুর্গম জায়গায় গিয়ে থেমে গেল। আসলে সে জায়গা ছিল শ্মশান।

পরিশেষে তিনি কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না। যেহেতু তিনি নিজের পান্ডিত্য নিয়ে গর্বিত ছিলেন। চলতে চলতে এক গ্রামে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি চরম ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছিলেন। এক অতিথিপরায়ণ বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করলে বাড়ির লোক তাঁকে আঁশকে বা চিতুই পিঠা খেতে দিল। তিনি ইতিপূর্বে সে পিঠা দর্শনও করেননি। দেখলেন, তার মাঝে মাঝে ছিদ্র বা ফুটা রয়েছে। এ কি খাদ্য

না অখাদ্য, তা দেখার জন্য তিনি পুঁথি খুললেন। মনোদ্বন্দ্বের সমাধানে তিনি একটি শ্লোক লক্ষ্য করলেন,

'ছিদ্রটি আছে যেথা,
অনিষ্ট ঘটে সেথা।'

শ্লোকটির উদ্দেশ্য ছিল, মাঠে-জঙ্গলে বা অন্য কোন ভূমিতে ছিদ্র বা গর্ত থাকলে এবং তার পাশে আশ্রয় গ্রহণ করলে বা বসলে অনিষ্ট ঘটতে পারে। কারণ সেখানে সাপ-বিছু ইত্যাদি থাকতে পারে এবং অনিষ্ট সাধন করতে পারে। কিন্তু পন্ডিতপ্রবর বুঝলেন, পিঠের ছিদ্রও তো ছিদ্র, তা খেলে যদি কোন অনিষ্ট হয়। সুতরাং এই আশঙ্কায় তিনি তা না খেয়ে আবার পথ চলতে লাগলেন।

ক্ষুধায় তিনি কাতর হয়ে পড়লেন। অন্য একটি গ্রামে এক বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করলে, তারা তাঁকে সেমাই খেতে দিল। তিনি সে খাবারও ইতিপূর্বে দর্শন করেননি। দীর্ঘ সূত্র বা লম্বা সুতোর মত দেখতে এই খাবার কেমন হয়, তা পরীক্ষা ক'রে নিতে তিনি আবার পুঁথি খুললেন। দেখলেন এক ছত্রে লেখা আছে,

'দীর্ঘসূত্রতাই অনিষ্টের মূল।'

সুতরাং আবারও অনিষ্টের আশঙ্কায় সে খাবার খেতে অস্বীকার করলেন। আর এইভাবে পুঁথিগত বোকা পন্ডিত পথে পথে পদে পদে দিশাহারা হয়েই এক সময় জীবন হারিয়ে ফেললেন।

কেউ পারে না, তার নিজের জ্ঞানে সত্য-মিথ্যা নির্ধারণ করতে। এর জন্য প্রয়োজন হয় আসমানী অহীর। জ্ঞান, বিবেক ও যুক্তি তো মানুষ পরিবেশ, শিক্ষা ও পড়াশোনা অনুযায়ী গ্রহণ ও প্রয়োগ ক'রে থাকে। তার সঠিকতার কি কোন নিশ্চয়তা আছে? ঐ দেখেন না, নিরীশ্বরবাদী নাস্তিক নিজ যুক্তিতে নাস্তিকতায় পারদর্শী। বহ্বীশ্বরবাদী, সর্বেশ্বরবাদী, মানবতাবাদী, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী, কবরবাদী সবাই নিজ নিজ জ্ঞান ও যুক্তি অনুযায়ী নিজেকে সঠিক পথের অনুসারী মনে করে। কোন ঈমানদার যুক্তিবাদী মানুষ কি নাস্তিকের যুক্তি মেনে নেবে?

দুনিয়ার বুকে বহু 'স্বিরাত্ব' আছে। আপনার-আমার 'স্বিরাত্বে মুস্তাক্বীম' কাম্য হওয়া উচিত। আর তা আছে অনুসরণে। কুরআন, সহীহ হাদীস ও সলফে সালেহীনের অনুসরণে।

পক্ষান্তরে মানুষ নিজের সীমিত জ্ঞান ও বিবেক অনুসারে পথ চললে ভ্রষ্ট হয়। স্বেচ্ছাচারিতার উপত্যকায় আপতিত হয়। কল্পনা ও ধারণার বশবর্তী হয়ে পথ চললে পথহারা হতে হয়। মহান আল্লাহ বলেন,

{أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ} (٢٣) سورة الجاثية

অর্থাৎ, তুমি কি লক্ষ্য করেছ তাকে, যে তার খেয়াল-খুশীকে নিজের উপাস্য ক'রে নিয়েছে? আল্লাহ জেনেশুনেই ওকে বিভ্রান্ত করেছেন এবং ওর কর্ণ ও হৃদয় মোহর ক'রে দিয়েছেন এবং ওর চোখের ওপর রেখেছেন পর্দা। অতএব, আল্লাহ মানুষকে বিভ্রান্ত করার পর কে তাকে পথনির্দেশ করবে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? *(সূরা জাসিয়াহ ২৩ আয়াত)*

{فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} (٥٠) سورة القصص

অর্থাৎ, অতঃপর ওরা যদি তোমার আহবানে সাড়া না দেয়, তাহলে জানবে ওরা তো কেবল নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে। আল্লাহর পথনির্দেশ অমান্য ক'রে যে ব্যক্তি নিজ

খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে, তার অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে? নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে পথনির্দেশ করেন না। *(সূরা ক্বাস্বাস ৫০ আয়াত)*

বাংলা শিক্ষিত যুবক ভাইদের কাছে আমাদের অনুরোধ, তাঁরা যেন কেবল বই পড়েই ক্ষান্ত না হন। বরং সেই সাথে কী বই পড়ছেন, কার বই পড়ছেন, তা যাচাই-বাছাই করার জন্য হক্কানী উলামাদের পরামর্শ নিন।

প্রচেষ্টা শুধু একার নয়। আমরা প্রবাসী কয়েকজন মিলে, 'হক বয়ান' করার প্রয়াস করেছি মাত্র। আল্লাহ আমাদেরকে তওফীক দিন, যেন আমরা হককে হকরূপে দেখতে পাই এবং তার অনুসরণ করি। আর বাতিলকে বাতিলরূপে দেখতে পাই এবং তার নিকট হতে শতক্রোশ দূরে থাকি। আমীন।

বিনীত---
আব্দুল হামীদ মাদানী
আল-মাজমাআহ, সঊদী আরব
মার্চ, ২০১০

সত্যান্বেষী যুবকদের পথভ্রষ্টতার কারণ

যে সকল মুসলিম যুবকদের মধ্যে দ্বীনী চেতনা ফিরে এসেছে, তাঁদের মধ্যে ইসলামকে জানার একটি পিপাসা রয়েছে। তাঁদের মধ্যে দ্বীনী জ্ঞান চর্চার আগ্রহ রয়েছে। কিন্তু সমস্যা হল তাঁদের কোন গাইড নেই। অথবা গাইডকে তাঁরা দুর্বল মনে করেন। যার ফলে তাঁদের পথের অন্বেষণ চলে অন্ধকারে---বিনা আলোয়, বিনা মানচিত্রে, বিনা রাহবারে। আর তার ফলে ভ্রষ্টতা অস্বাভাবিক নয়। কোথাও পিচ্ছল পথে পা পিছলে আছাড় খাওয়া অদ্ভুত ব্যাপার নয়।

সাধারণভাবে মুসলিম যুবকদের ভ্রষ্টতার কারণ যদি আমরা নির্ণয় করতে যাই, তাহলে একাধিক কারণ আমাদের দৃষ্টিগোচর হবে। যেমন ঃ

১। ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা-ব্যবস্থা, প্রচার-মাধ্যম, রাজনৈতিক পরিস্থিতি ইত্যাদি। এই পরিমণ্ডলে বসবাস ক'রে মুসলিম যুবক নিজেকে নতুন ছাঁচে ঢেলে গড়তে চায়। অন্য ধর্মের কাছাকাছি হতে চায়, অন্য ধর্মের মানুষকে নিজের কাছাকাছি করতে চায়। আর তার ফলে যদি কোন ত্যাগ স্বীকার অর্থাৎ, ধর্মীয় বিশ্বাসকে বাদ দিতে হয়, তাতেও রাজি। যেহেতু ভিন্ন ধর্মের মানুষদের নিকটে নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। আর তাতে তাঁরা বিব্রত হয়ে নিজের ধর্মে সন্দিহান হয়ে বসে।

২। কুসংস্কারাচ্ছন্ন পরিবেশও মুসলিম যুবককে ভ্রষ্টতার কুহকে ফেলে। ধর্মের নামে কিছু বিশ্বাস, কুসংস্কার ও আচার এমন আছে, যা আসলে শরীয়তে বিদআত। যার কোন দলীল নেই, উপরন্তু তা যুক্তিগ্রাহ্য নয়। যা দেখে অনুরূপ কোন শরয়ী বিধানকে সে সন্দেহের চোখে দেখে।

আমেরিকা থেকে ডাক্তার হয়ে সদ্যঃ প্রত্যাবৃত্ত এক যুবক দ্বীনদার বাবার সাথে জুমআর নামায পড়তে গেছে। বাবার পাশে দেখাদেখি সুন্নত পড়তে পড়তে তার হাওয়া সরে গেছে। বাবার কানে এলে ছেলেকে বলল, 'বাবা! তোমার ওযূ ভেঙ্গে গেছে, ওযূ ক'রে এসো।'

ছেলে বলল, 'কেন? ওযূও কি ভঙ্গুর জিনিস?'

বাবা বলল, 'হ্যাঁ, তোমার হাওয়া সরেছে।'

ছেলে বলল, 'তার মানে, আবার কি মুখ-হাত-পা ধুতে হবে?'
বাবা বলল, 'হ্যাঁ।'
ছেলে বলল, 'আর যেখান থেকে হাওয়া বের হল, সেখানটা ধুতে হবে না?'
বাবা বলল, 'না।'
ছেলে বলল, 'তা কোন্ যুক্তিতে?'
বাবা বলল, 'যে যুক্তিতে তোমরা এক জায়গায় ব্যথা আর অন্য জায়গায় ইঞ্জেকশন ফুঁড়ো!'
ছেলে যুক্তি মেনে নিতে পারল না। তবুও লোক-দেখানি ধর্ম মানতে তা করতে বাধ্য হল।

মনে সন্দেহ নিয়েই অনেকে ধর্ম পালন করে, অনেকে করে না, অনেকে তর্ক করে। মূলে কিন্তু সত্যিকারেরই কিছু কুসংস্কার।

৩। আদর্শচ্যুত আলেম-উলামা যুবকদের পথভ্রষ্টতার কারণ হয়। তাঁদের অতিরঞ্জন অথবা অবহেলার আমল দেখে, কুরআন-হাদীসের ভুল ব্যাখ্যা শুনে বা পড়ে হকপথ থেকে দূরে সরে যায়।

৪। ইসলাম-বিরোধী লেখা প্রসিদ্ধ পত্র-পত্রিকা তথা অমুসলিমদের নিকট আদরণীয় হওয়ার ফলে প্রসিদ্ধির লোভে সেই স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয় এবং তখন সে তাই বিশ্বাস করে ও লেখে, যা অমুসলিম অথবা ধর্মনিরপেক্ষবাদী মুসলিম অথবা মুনাফিকরা পছন্দ করে। সে নিজে ভ্রষ্ট হয়, অপরকেও ভ্রষ্ট করে। অপর দিকে হকপন্থী অসংখ্য মুসলিম ও তাদের আলেম-উলামাদের প্রতি অবজ্ঞার চাবুক হেনে নিজেকে প্রসিদ্ধির মঞ্চে প্রতিষ্ঠা করে। আর তার ফলে কারও নিকট থেকে সে ফুল পায় এবং কারও নিকট থেকে অভিশাপ।

৫। পড়াশোনায় আহলে সুন্নাহ অল-জামাআতের মতাদর্শকে দৃষ্টিচ্যুত করলে অথবা কুরআন ও সহীহ হাদীস-ভিত্তিক জ্ঞানচর্চা না করলে যুবক ভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতার শিকার হয়। যেমন যয়ীফ ও জাল হাদীসের বেড়াজালে পড়ে পথচ্যুত হয়, তেমনি সহীহ হাদীসকে না বুঝে অস্বীকার করলেও পথহারা হয়।

আকীদা, আমল ও পড়াশোনা কুরআন ও হাদীস উভয়ভিত্তিক হওয়া জরুরী

কিছু যুবক আছেন, যাঁরা সকল হাদীস অস্বীকার করেন না। তাঁরা যেটাকে পছন্দ করেন, যেটা তাঁদের জ্ঞানে ধরে, যুক্তিযুক্ত মনে হয়, সেটা মানেন। যে হাদীস তাঁদের জ্ঞানে ধরে না, সেটাকে মানেন না। তাঁরা কুরআন ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থে বিশ্বাস রাখেন না। তাঁরা লেখকের মতো পরিষ্কারভাবে ফতোয়া দিয়ে বলেন,

'ঈমানের প্রশ্নে কোরাণ ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থের উপর বিশ্বাস করা ঈমানদারের কাজ নয়।' (তত্ত্ব......৩৫পৃঃ)

'যদি আমরা কোরাণ-ভিত্তিক যুক্তিবাদী (?) না হই, তাহলে প্রকাশ্য ভুলগুলি স্বীকার ও ত্যাগ করতে সক্ষম হব না।'(তত্ত্ব......২২পৃঃ)

'যেমন সোনা ও পিতলের পার্থক্য করে কষ্টিপাথর। তেমনি শরিয়তেরও কষ্টিপাথর হল গভীর ভাবনা ও বিশ্লেষণ!'(তত্ত্ব......৫১পৃঃ)

মাশাআল্লাহ! এ নতুন নীতি যেন নব নবুয়তের অভিনব চিন্তাধারা! আল্লাহর শরীয়তকে মানুষ কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ দিয়ে নয়, বরং 'গভীর ভাবনা ও বিশ্লেষণ' দিয়ে যাচাই-বাছাই করতে হবে। এ যেন স্বর্ণ যাচাই করতে কর্মকারের কাছে যাওয়া! দেহের সূক্ষ্ম অপারেশন করতে

নাপিতের কাছে যাওয়া! কিন্তু তাতে যে, রোগ সারাতে গিয়ে রগ কাটা যাবে!

বলা বাহুল্য, সুন্নাহ বা হাদীস না মেনে ঈমান রক্ষা করা যাবে না। আর মানুষের সীমিত জ্ঞান দিয়ে সুন্নাহ বিচার করা যাবে না। সুন্নাহ মুহাদ্দিসীনদের নিকট সনদের তাহকীকে 'সহীহ' বলে প্রমাণিত হলে তা না মানার জন্য ধানাই-পানাই করা যাবে না। এটাই আহলে সুন্নাহর নীতি। বাকী কেউ তা না মানলে, সে যদি মুর্তাদও হয়ে যায়, তাতে কার কী বলার থাকতে পারে?

'যুক্তিহীন আবেগপূর্ণ অন্ধ-বিশ্বাস কখনই ইসলাম হতে পারে না।' (তত্ত্ব.....৫১পৃঃ) এ কথা কুরআন ও সহীহ হাদীস ছাড়া অন্য কারো ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। নচেৎ কুরআন ও সহীহ হাদীসের প্রতি যদি কারো যুক্তিহীন আবেগপূর্ণ অন্ধ-বিশ্বাস না থাকে, তাহলে সে মুসলিম হতেই পারবে না।

হাদীস অমান্য করার কারণ

বিভিন্ন শ্রেণীর হাদীস অমান্যকারী রয়েছে।

কুরআনী ফির্কা মোটেই হাদীস মানে না।

কেউ কেউ 'যওক' হিসাবে হাদীস গ্রহণ ও বর্জন করেন।

কেউ কেউ 'আক্কেল'-এর মীযানে হাদীস গ্রহণ ও বর্জন করেন। (যেন তাঁদের আক্কেলটাই সৃষ্টিকর্তা ও তাঁর দূতের বাণীর কষ্টিপাথর! তাঁদের মূল বক্তব্য হল, যে হাদীস আমাদের জ্ঞানে ধরবে, সেটি হাদীস বলে মানব; যদিও তা জাল হাদীস হয়। আর যেটা আমাদের জ্ঞানে ধরবে না, তা মানব না; যদিও তা মুতাওয়াতির বা বুখারীর হাদীস হয়! এঁরা এঁদের শাকবেচা দাঁড়িপাল্লা নিয়ে সোনা অথবা পাহাড় ওজন করতে চান!

এঁরা যদি শোনেন যে, আল্লাহর রসূল (সঃ) বলিয়াছেন, "বিদ্যা যতই বাড়ে, ততই জানা যায় যে, কিছুই জানি না। টাকার সেই দশা; টাকা যতই বাড়ে, ততই মনে হয়, টাকা নাই বলিলে হয়।" তাহলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠবেন, 'অবশ্যই এটা হাদীস। কারণ, এতো খুব দামী কথা, যুক্তিগ্রাহ্য বাস্তব কথা।' তার সনদ বা সূত্র দেখার প্রয়োজন নেই। সত্যপক্ষেই তা আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন কি না, তা তলিয়ে দেখার কোন প্রয়োজন নেই।

পক্ষান্তরে এঁরা যখন শুনেন যে, বুখারী-মুসলিম শরীফে আছে, "আল্লাহর নবী ﷺ-এর আঙ্গুলের ইশারায় চাঁদ দু-টুকরা হয়েছিল।" তখন বলেন, তাই আবার হয় নাকি? এটা গাঁজাখুরি গল্প। কারো আঙ্গুলের ইশারায় কি চাঁদ দ্বিখণ্ড হয়? হলেই বা তিনি মহানবী। একটা সম্ভব-অসম্ভব তো আছে।

যদি বলা হয়, 'কুরআনেও তার ইঙ্গিত আছে।' তাহলে এঁরা বলেন, 'তা যে নবীর যুগে তাঁর আঙ্গুলের ইশারায় তার প্রমাণ কি?'

আমরা বলি, মহান আল্লাহ বলেছেন,

اقْتَرَبَتْ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ (١) وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ (٢) وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ (٣) وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ الأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ (٤) حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ (٥) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِي إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ (٦) خُشَّعاً أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنْ الأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ (٧) مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِي يَقُولُ

الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ (٨)

অর্থাৎ, কিয়ামত আসন্ন, চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। তারা কোন নিদর্শন দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, 'এটা তো চিরাচরিত যাদু।' তারা মিথ্যা মনে করে এবং নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে, আর প্রত্যেক কাজের জন্য একটি স্থিরীকৃত সময় রয়েছে। তাদের নিকট এসেছে সংবাদ, যাতে আছে ধমক। এটা পরিপূর্ণ জ্ঞান, তবে এই সতর্কবাণীসমূহ তাদের কোন উপকারে আসেনি। অতএব তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর। (সেদিনকে স্মরণ কর,) যেদিন আহবানকারী (ইস্রাফীল) আহবান করবে এক অপ্রিয় বিষয়ের দিকে। অপমানে অবনমিত নেত্রে কবর হতে বের হবে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের ন্যায়। তারা আহবানকারীর দিকে ছুটে আসবে ভীত-বিহ্বল হয়ে। অবিশ্বাসীরা বলবে, 'এ তো কঠিন দিন।' (সূরা ক্বামার ১-৮ আয়াত)

দ্বিতীয় নং আয়াত থেকে ৮নং আয়াত পর্যন্ত বাক্যাবলীতে উদ্দিষ্ট কারা? কারা বলেছিল, 'এটা তো চিরাচরিত যাদু।' তারা কি মক্কার কাফেররা নয়?

আপনি যদি বলেন, 'আল্লাহ নিজ কুদরতে চাঁদ দ্বিখন্ডিত করতে পারেন।'

তাহলে এঁরা বলবেন, 'আল্লাহ করিতে পারেন সব---তোমাকে বা আমাকে পাগল করিতে পারেন। তাই তুমি আমাকে বা আমি তোমাকে পাগল গণ্য করিব? ইহা যে ঘটিয়াছে---ঐতিহাসিকভাবে তাহার প্রমাণ দাও।'

কিন্তু আমরা বলি, 'কোন লোক যদি সত্যই পাগল হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাকে পাগল মানিতে অসুবিধাটা কোথায়? প্রমাণ তো বুখারী-মুসলিম প্রভৃতি গ্রন্থ। কিন্তু বাস্তববাদী মনে তাহা যদি গ্রহণ না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাদের বলিবার আর কি-ইবা থাকিতে পারে?'

এক সময় এমন ছিল, কিছু বস্তুবাদী বুখারী শরীফের পানিতে মাছি পড়লে তা ডুবিয়ে পানি খাওয়ার হাদীসকে অস্বীকার করত। বর্তমানের রিসার্চে মাছির এক ডানায় রোগজীবাণু ও অপর ডানায় তার প্রতিরোধক বস্তু থাকার কথা আবিষ্কার হওয়ায় তাঁদের অনেকে 'সুবহানাল্লাহ' পড়ছেন।

মুহাদ্দিসীন তথা আহলে সুন্নাহ অল-জামাআহ বা আহলে হাদীস মতে যয়ীফ ও জাল হাদীস মানা যাবে না। সুতরাং কোন হাদীস সামনে এলে মু'মিনের কর্তব্য হল ঃ-

১। এই দৃঢ় বিশ্বাস রাখা যে, হাদীস হল দুটি অহীর অন্যতম।

২। হাদীসের বক্তব্যকে নির্ভুল ও নিষ্কলুষ বলে নিঃসন্দেহে মেনে নেওয়া। যেহেতু হাদীস যাঁর তিনি হলেন নির্ভুল ও নিষ্পাপ মানুষ।

৩। সেটা সত্যপক্ষে তাঁর হাদীস কি না, তা অনুসন্ধান করা ওয়াজেব। তা সহীহ কি না, তা জানা জরুরী।

৪। সহীহ প্রমাণিত হলে তা সর্বান্তঃকরণে মেনে নেওয়া ওয়াজেব; যদিও তা নিজ জ্ঞান ও বিবেক বহির্ভূত মনে হয় এবং তার পিছনে যুক্তি ও হিকমত না বুঝা যায়।

৫। যয়ীফ (দুর্বল), বা মওযূ' (জাল) প্রমাণিত হলে তা বর্জন করা।

৬। হাদীসের সঠিক অর্থ বুঝা। আপাতদৃষ্টিতে দুটি হাদীস পরস্পর-বিরোধী মনে হলে তা সমন্বয় ও সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টা করা। নিজে না পারলে বিশেষজ্ঞ আলেম-উলামাকে জিজ্ঞাসা করা।

৭। হাদীসের নাসেখ-মনসূখ (রহিত-অরহিত) নির্দেশ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা।

কুরআন-বিরোধী বা স্ববিরোধী হলে তার ব্যাখ্যা খুঁজতে হবে। সে হাদীসকে ফুঁক দিয়ে ছাই বা ধুলো উড়ানোর মত উড়িয়ে দেওয়ার দুঃসাহসিকতা করা যাবে না।

যদি একান্তই কোন সহীহ হাদীসের অর্থ বুঝে না আসে অথবা বিবেক-বহির্ভূত মনে হয়, তাহলে কুরআনী আয়াতের ব্যাপারে যে নীতি অবলম্বন করা হয়, সেই নীতিই অবলম্বন করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

{هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ} (٧) سورة آل عمران

অর্থাৎ, তিনিই তোমার প্রতি এই কিতাব (কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন; যার কিছু আয়াত সুস্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন, এগুলি কিতাবের মূল অংশ; যার অন্যগুলি রূপক; যাদের মনে বক্রতা আছে, তারা ফিতনা (বিশৃংখলা) সৃষ্টি ও ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে যা রূপক তার অনুসরণ করে। বস্তুতঃ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না। আর যারা সুবিজ্ঞ তারা বলে, 'আমরা এ বিশ্বাস করি। সমস্তই আমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে আগত।' বস্তুতঃ বুদ্ধিমান লোকেরাই উপদেশ গ্রহণ করে। *(সূরা আলে ইমরান ৭ আয়াত)*

আর দুআ ক'রে বলতে হবে,

{رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ} (٨)

অর্থাৎ, হে আমাদের প্রতিপালক! সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে বক্র ক'রে দিও না এবং তোমার নিকট থেকে আমাদেরকে করুণা দান কর। নিশ্চয় তুমি মহাদাতা। *(ঐ ৮ আয়াত)*

কুরআনের এক আয়াত অন্য আয়াতের বিরোধী হতে পারে না। হলে মানসূখ হতে পারে। অনুরূপ হাদীসও। তেমনি কোন সহীহ হাদীস কুরআনের বিপরীত হতে পারে না। হলে মানসূখ হতে পারে। এ ছাড়া পরস্পরবিরোধী মনে হলে অন্য কোন সামঞ্জস্য ও সমন্বয়-পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে, যা উলামাগণ বর্ণনা ক'রে গেছেন। তাঁদের সে নীতি ও পদ্ধতি গ্রহণ না করে নিজের মনে 'হাদীস হতে পারে না' বলে অস্বীকার করা কোন জ্ঞানী মু'মিনের কাজ নয়।

'যওক'-ভিত্তিক ও তথাকথিত কুরআন-ভিত্তিক তাহকীক ও যুক্তির নিকষে সহীহ হাদীসকে উড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা নতুন নয়। বহু পূর্বে মু'তাযিলা ফির্কা আক্বেলকে প্রাধান্য দিয়ে উক্ত কাজ ক'রে গেছে। গত শতাব্দীতে মওলানা মওদূদী ও আকরাম খাঁ সাহেবদ্বয়ও সহীহ হাদীসকে হাদীস বলে না মানার মত তাহকীক দেখিয়ে গেছেন। সমসাময়িককালে তার সমালোচনাও হয়েছে। আমরা ভাবতাম, আমাদের যুবকরা সে বিষয়ে সচেতন। কিন্তু এখন দেখছি, সেই আকলী মাদ্রাসার ছাত্র কোথাও কোথাও মাথা নাড়া দিয়ে উঠছে। শুধু মনের মধ্যেই সেই রোগে সংক্রমিত হয়ে রোগগ্রস্ত নয়, বরং বই লিখে তা আরো ব্যাপক করার প্রয়াসে তৎপর হয়েছেন! আমার মনে হয়, তাঁরা যদি তাঁদের ঐ আধুনিক তাহকীকের বিরুদ্ধে সমালোচনা পড়তেন, তাহলে হক বুঝে হকের সমালোচনা করতেন না।

উদাহরণ স্বরূপ সহীহ হাদীসকে অস্বীকার করার ফলে এক যুক্তিবাদীর সমালোচনায় বলা হয়েছে, 'পূর্ব বর্ণিত জনৈক বাঙ্গালী পণ্ডিত হাদীছখানার তাৎপর্য বিপরীত বুঝিয়া তথাকথিত "তফসীরুল কুরআন"-এ এই হাদীছখানার সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি নিজের স্বল্প জ্ঞানহেতু ভুলে পতিত হইয়া নানারূপ প্রলাপোক্তি করিয়াছেন---হাদীছকে এনকার করিয়াছেন, হাদীছ বর্ণনাকারীর প্রতি ক্ষেপিয়াছেন। এমনকি চরম ধৃষ্টতায় বিশিষ্ট সাহাবী আবু হোরায়রা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর প্রতি বেআদবী করতঃ বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, এইটা আবু হোরায়রার গর্হিত বয়ান এবং বোখারী-মুসলিম শরীফে উল্লেখ হইয়া থাকিলেও পণ্ডিত মিয়া

ইহাকে হাদীছ বলিয়া গ্রহণ করিবেন না।

এই সকল প্রলাপোক্তির একমাত্র কারণ হইল, হাদীছখানার মূল তাৎপর্যে পৌঁছিবার অসমর্থতা। তিনি বুঝিয়াছেন যে, ইহাতে হযরত ইব্রাহীমের মিথ্যা বলা প্রতিপন্ন হয়।

বস্তুতঃ ইহা এই হাদীছের তাৎপর্য নহে, বরং ইহা পণ্ডিত মিঞার অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী প্রসূত বক্র ও ভুল ধারণা হইতে সৃষ্ট।' (বাংলা বোখারী শরীফ ৪/৯৩)

আরো বলা হয়েছে,

'....এই সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করিয়াই একটা নিজের মনগড়া আজগুবি গোঁজামিলকে পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যারূপে প্রাধান্য দিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, তিনি বাংলাভাষায় পাণ্ডিত্যের জোরে অন্যান্য ভাষাকেও ঠেলিয়া নিয়া যাইতে চেষ্টা করেন এবং লাগামহীনভাবে সিদ্ধান্ত করিয়া বসেন। তিনি যদি আরবী ভাষায় সাধারণ জ্ঞানও রাখিতেন তবে ঐরূপ বাস্তবের বিপরীত স্বপ্ন দেখিতেন না।' (ঐ ৪/ ১৩৪)

ভুল বুঝার আরো একটি কারণ যে, ঐ শ্রেণীর পাঠচক্রের যুবকরা যা পড়েন, তা কোন হক্কানী আলেম-উলামার কাছে বসে বুঝে নেন না। বরং সীমাবদ্ধ বুঝেই নিজের বুঝটাকে বড় মনে করেন। অথচ সে বুঝ তাঁর জন্য বোঝা স্বরূপ। আরবের উলামাগণ বলেন,

من كان كتابه شيخه، كان خطأه أكثر من صوابه.

অর্থাৎ, কিতাব যার ওস্তাদ হয়, ঠিকের থেকে তার বেঠিক (জ্ঞান) বেশী হয়।

হয়তো তাঁরা অন্য শ্রেণীর আলেম-উলামার কাছে বসে দর্স নেওয়াটা 'মনুষ্যমেধা নষ্ট' করার সমতুল্য মনে করেন অথবা তাঁদেরকে কাঠমোল্লা ভাবেন।

সুবিধাবাদীরাও বহু সহীহ হাদীসকে অস্বীকার করতে পারে। যেমন ঃ-

যারা গান-বাজনা শুনতে অভ্যস্ত, তারা বলবে, 'গান-বাজনা হারাম হওয়ার কথা কুরআনে নেই। অতএব বুখারীর হাদীস ভিত্তিহীন।'

যে ব্যাংকের সূদ খায়, সে বলবে, 'ব্যাংকের সূদ হারাম হওয়ার কথা কুরআনে নেই।'

যে বিড়ি-সিগারেট বা তামাক-জর্দা খায়, সে বলবে, 'তা হারাম নয়। যেহেতু কুরআনে তা হারাম করা হয়নি। অতএব কোন হাদীস থেকে তা হারাম প্রমাণ করা হলে তা হবে কুরআনের পরিপন্থী।

যে দাড়ি চাঁছে ও অপরের চেঁছে পয়সা কামায় সে বলবে, 'দাড়ি চাঁছা হারাম হওয়ার কথা কুরআনে নেই।'

যে তাবীয-ব্যবসা করে, সে বলবে তাবীয-ব্যবসা হারাম হওয়ার কথা কুরআনে নেই।

দু'টি নামায (ফজর ও এশা) ছাড়া কুরআনে অন্য নামাযের নাম উল্লেখ নেই। কেউ বলতে পারে, 'সুতরাং অন্য নামায পড়তে হবে না।'

যারা ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়ে না, তারা সহীহ হাদীস রদ ক'রে বলে, 'তা কুরআন-বিরোধী।'

কেউ বলতে পারে, 'কুকুর খাওয়া হারাম নয়, কারণ সে কথা কুরআনে নেই।'

স্ত্রীর মাসিক হলে তার বিছানায় শোয়া যাবে না। শুলে কুরআন-বিরোধী আমল হবে। কারণ কুরআন বলে,

{فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ} (٢٢٢) سورة البقرة

অর্থাৎ, তোমরা রজঃস্রাবকালে স্ত্রীসঙ্গ বর্জন কর এবং যতদিন না তারা পবিত্র হয়, (সহবাসের জন্য) তাদের নিকটবর্তী হয়ো না। *(সূরা বাক্বারাহ ২২২ আয়াত)*

সোনা-চাঁদি, টাকা-পয়সা মোটেই জমা করা যাবে না। কারণ তা কুরআন-বিরোধী আমল হবে। যেহেতু কুরআন বলে,

{وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ}

অর্থাৎ, যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তুমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ শুনিয়ে দাও। *(সূরা তাওবাহ ৩৪ আয়াত)*

মহিলা নেতৃত্ব কুরআনে নিষেধ নেই। অতএব নেতৃত্ব অবৈধ হওয়ার হাদীসটি জাল।

ব্যভিচারের শাস্তি পাথর মারা কুরআনে নেই। মৃত্যুদণ্ড কুরআন-বিরোধী। কারণ কুরআনে ১০০ চাবুক মারার কথা বলা হয়েছে।

মৃত খাওয়া হারাম কুরআনে আছে। অতএব মৃত মাছ খাওয়া হাদীসে থাকলেও তা মান্য নয়। মাছ মারা গেলে খাওয়া যাবে না।

কুরআনে আছে নিজের আত্মীয় (ছেলে-মেয়ে)র নামে সম্পত্তি উইল করা যাবে। *(সূরা বাক্বারাহ ১৮০ আয়াত)* হাদীসে আছে কোন ওয়ারেসের নামে উইল বৈধ নয়। সে হাদীস সহীহ হলেও জাল।

স্ত্রীকে তিন তালাক দিলেও তার জীবনভর খোরপোশ দিতে হবে; কারণ কুরআনে আছে,

{وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} (٢٤١) سورة البقرة

অর্থাৎ, তালাকপ্রাপ্তা নারীগণও যথাবিহিত খরচপত্র (ক্ষতিপূরণ) পাবে। সাবধানীদের জন্য এ (দান) অবশ্য কর্তব্য। (সূরা বাক্বারাহ ২৪১ আয়াত)

'(কনের) অভিভাবক ছাড়া বিবাহ শুদ্ধ নয়।' এ হাদীসকে সূরা বাক্বারার ২৩০নং আয়াতের পরিপন্থী মনে ক'রে মযহাবধারীরা রদ ক'রে থাকেন। অনুরূপ আরো হাদীস।

'নবীর সম্পত্তির কেউ ওয়ারেস হয় না।' এ হাদীসকে কুরআনের সূরা নিসার ১১নং আয়াতের বিরোধী ধারণা ক'রে শিয়ারা রদ ক'রে থাকে। অনুরূপ আরো হাদীস।

মহান আল্লাহর হাত-পা ইত্যাদির সহীহ হাদীসকে জাহমিয়্যাহরা প্রত্যাখ্যান করেছে। কারণ তাদের ধারণামতে তা সূরা শূরার ১১নং আয়াতের পরিপন্থী। অনুরূপ আরো হাদীস।

খাওয়ারেজরাও তাদের মযহাব-বিরোধী সকল সহীহ হাদীসকে কুরআনের বিপরীত ধারণা ক'রে রদ করেছে।

ক্বাদারিয়্যাহরাও তাদের মযহাব-বিরোধী সকল সহীহ হাদীসকে কুরআনের কোন কোন আয়াতের পরিপন্থী ধারণা ক'রে রদ করেছে।

জাবারিয়্যাহরা তাদের মযহাব-বিরোধী সকল সহীহ হাদীসকে কুরআনের কোন কোন আয়াতের পরিপন্থী ধারণা ক'রে প্রত্যাখ্যান করেছে।

অনুরূপ আরো বহু ফির্কা বহু সহীহ হাদীসকে শুধু এই জন্য রদ করেছে যে, তা তাদের ধারণামতে কুরআনের বিরোধী!

আসলে হাদীস মানবে না। কিন্তু সরাসরি রদ করতে পারে না। কারণ তাহলে তো লোকে 'কাফের' বলবে। সুতরাং না মানার অজুহাতে কুরআনী-দলীল খুঁজে বের করে, অতঃপর তা রদ করে।

কবরের আযাবকে অনেকে স্বীকার করে না, কারণ এত বড় বড় আযাবের কথা কুরআনে নেই।

কুরআনে 'মেহেরাজ' শব্দ নেই। অতএব তাও অবিশ্বাস্য হওয়ার কথা। যেমন দাজ্জাল শব্দ নেই, অতএব তার আগমনের কথা আজগুবি গল্প মাত্র!

আল্লাহর নবী ﷺ-কে কত মু'জিযা দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সে কথা কুরআনে নেই। অতএব মু'জিযার যাবতীয় হাদীস ভিত্তিহীন!

যদিও মু'জিযা নবী বা তাঁর বিরোধীদের দাবী ও চাওয়া অনুপাতে দেওয়া হয় না। কেবল আল্লাহর ইচ্ছা অনুপাতে দেওয়া হয়। উল্লেখ না থাকলে কি তা অস্বীকার করা যায়?

কুরআনে যদি (ধারণামতে) কুরআন-বিরোধী অথবা পরস্পরবিরোধী কথা পান, তাহলে জ্ঞানীরা কী বলেন?

অনুরূপ সহীহ হাদীসে যদি কুরআন বিরোধী কথা আসে, তাহলে কেন জ্ঞানীদের কথা মান্য নয়?

ঐ স্বেচ্ছাচারিতা ও ফির্কাবন্দীর ফলেই বিভিন্ন দলের সৃষ্টি হয়েছে। আর তার একটি মু'তাযিলা ফির্কা। যারা আক্কেলের ঘোড়া ছুটিয়ে সহীহ হাদীস তথা মু'জিযা ও অনেক কিছুকে অস্বীকার করেছে। আর খাঁ সাহেব ও তাঁর যুক্তিমুগ্ধরা ঐ মাদ্রাসারই ছাত্র।

শরীয়তে জ্ঞান-ভিত্তিক যুক্তির মান

ইসলামী শরীয়তে যখন কুরআন ও সহীহ হাদীসের স্পষ্ট উক্তি বর্তমান থাকে, তখন জ্ঞান-ভিত্তিক যুক্তি কোন কাজে লাগে না। যেহেতু শরীয়ত-ওয়ালার জ্ঞান অপেক্ষা মানুষের জ্ঞান বড় ও শ্রেষ্ঠ হতে পারে না। জ্ঞানে ধরার মত কথা না হলে তার ব্যাখ্যা খুঁজতে হয়; নচেৎ হুবহু ঈমান রাখতে হয়। কোনক্রমেই শরীয়তের উক্তির উপরে যুক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া যাবে না। এ প্রসঙ্গে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রঃ) 'দারউ তাআরুযিল আক্বলি অন্‌-নাক্বল' নামক মূল্যবান একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাতে তিনি আশায়েরাহ প্রভৃতি আক্কেলপন্থীদের প্রতিবাদ করেছেন, যারা শরয়ী উক্তির উপর নিজেদের জ্ঞান ও যুক্তিকে অগ্রাধিকার দেয়। রাযী, গাযালী, জুওয়াইনী, কাযী আবূ বাকর ইবনুল আরাবী, বাক্বিল্লানী প্রমুখ যুক্তিবাদীদের খণ্ডন করেছেন।

নিঃসন্দেহে শরয়ী উক্তির উপর যুক্তির প্রাধান্য পাওয়ার বিষয়টি অতি বিপত্তি ও আপত্তিকর। যেহেতু এই ছিদ্রপথে জাহেল মানুষরাও শরীয়তের উক্তি নিয়ে খেল খেলতে শুরু ক'রে দেয়। জ্ঞানে ধরার কথা নয় মনে ক'রে তা প্রত্যাখ্যান ও অস্বীকার ক'রে বসে! আর তার ফলে হাদীস না বুঝে নিজের দায় স্বীকার না ক'রে বুখারী-মুসলিমের হাদীস পর্যন্ত অস্বীকার ক'রে ফেলে!

এই কারণে ইমাম ইবনুল কাইয়েম তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আস্‌-স্বাওয়াইক্বুল মুরসালাহ'তে শরয়ী উক্তির উপর যুক্তিকে প্রাধান্যদাতাকে সেই চারটি তাগূতের মধ্যে গণ্য করেছেন, যারা ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। আর ২৪১ ভাবে সেই তাগূতের খণ্ডন করেছেন।

শায়খুল ইসলাম (রঃ) স্পষ্ট করেছেন যে, সুস্থ ও নিরপেক্ষ বিবেক সহীহ দলীলের অনুসারী অবশ্যই হবে। সঠিক যুক্তি ও সহীহ দলীলের মধ্যে কোন প্রকার সংঘর্ষ হতে পারে না। বিপরীত মনে হলে মানুষের সীমিত বিবেককেই দুষ্ট ও অসুস্থ জানতে হবে।

আবূ মুযাফ্‌ফার সামআনী বলেন, 'জেনে রাখুন যে, আমাদের ও বিদআতীদের মাঝে পার্থক্যকারী হল আক্কেলের বিষয়টি। বিদআতীরা তাদের আক্কেলের উপর নিজেদের দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। অতঃপর অনুসরণ ও শরয়ী উক্তিকে তার অনুগামী করেছে। পক্ষান্তরে আহলে সুন্নাহর নীতি হল দ্বীনের মূল বিষয় (শরয়ী উক্তির) অনুসরণ এবং আক্কেল ও যুক্তি তার অনুগামী। কেননা দ্বীনের ভিত্তি যদি আক্কেল হত, তাহলে মানুষ অহী ও আম্বিয়ার অমুখাপেক্ষী হত এবং আদেশ ও নিষেধ অর্থহীন হয়ে পড়ত। যার যা ইচ্ছা তাই বলত। দ্বীন যদি যুক্তির

উপর ভিত্তিশীল হত, তাহলে যুক্তিগ্রাহ্য না হওয়া পর্যন্ত কোন মু'মিনের জন্য কিছু গ্রহণ করা বৈধ হত না।' *(স্বাওনুল মানত্বিক্ব ১৮২পৃঃ)*

ত্বাহাবিয়ার ব্যাখ্যাকারী বলেন, 'দ্বীনের মৌলিক নীতি সম্বন্ধে সেই ব্যক্তি কিভাবে কথা বলে, যে ব্যক্তি তা কিতাব ও সুন্নাহ থেকে আহরণ করেনি? বরং সে অমুকের উক্তি থেকে তা গ্রহণ করে। আর যখন মনে করে যে, সে আল্লাহর কিতাব বোঝে, তখন তা রসূলের হাদীস থেকে সে তফসীর গ্রহণ করে না; বরং হাদীসের প্রতি সে ভ্রূক্ষেপই করে না। তফসীর গ্রহণ করে না সাহাবা-তাবেঈন কর্তৃক বর্ণিত আসার থেকে।'

বরং তারা বলে, 'সাহাবা-তাবেঈনদের কথা তৎকালীন যুগে উত্তম ছিল।' তার মানে এ যুগে তাঁদের কথা উত্তম নয়! কারণ এ যুগ তো টেলিভিশনের যুগ।

বরং এক শ্রেণীর মানুষ আছে, যারা বলে 'হাদ্দাসানী ক্বালবী আর-রাব্বী।' (অর্থাৎ, আমার হৃদয় আমার রব থেকে হাদীস বর্ণনা করেছে......।) অনুরূপ ঐ শ্রেণীর যুক্তিবাদীরা বলেন, 'হাদ্দাসানী আক্বলী আর-রাব্বী!' (অর্থাৎ, আমার আক্কেল আমার রব থেকে হাদীস বর্ণনা করেছে......।)

আকীদা ত্বাহাবিয়া ও তার ভাষ্যগ্রন্থে বলা হয়েছে, কোন মুসলিমের ইসলামের পা সুদৃঢ় হতে পারে না, যতক্ষণ না সে দুই অহীকে সর্বান্তঃকরণে মেনে নিয়েছে এবং আনুগত্যের জন্য আত্মসমর্পণ করেছে।

অর্থাৎ, বিনা দ্বিধায় দুই অহীর ফায়সালা মেনে না নিলে কারো ইসলাম তার মনের ভূমিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। যখন সে অহীর বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ আনবে না, মনের ভিতরে কোন 'কিন্তু' আনবে না, নিজের রায়, বিবেক ও যুক্তিকে প্রাধান্য দিয়ে তার বিরোধিতা করবে না, নিজের জ্ঞানকে বড় মেনে অহীতে সন্দেহ পোষণ করবে না।

ইমাম মুহাম্মাদ বিন শিহাব যুহরী বলেছেন, 'আল্লাহর তরফ থেকে রিসালাত এসেছে, রসূলের দায়িত্বে ছিল, সে রিসালাত পৌঁছে দেওয়া। আর আমাদের দায়িত্ব হল তা মেনে নেওয়া।'

সুতরাং সেই অহীদ্বয় ব্যতীত জ্ঞান-ওয়ালার কোন পরিত্রাণ নেই। আল্লাহর তওহীদ এবং রসূলের আনুগত্যের তওহীদ ছাড়া মুক্তির কোন পথ নেই।

একটু চিন্তা ক'রে দেখলে দেখা যাবে যে, শরীয়তে নানা বিঘ্ন ও বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে তিন শ্রেণীর মানুষের কারণে।

১। স্বেচ্ছাচারী ও অত্যাচারী শাসক। এঁরা নিজেদের অবৈধ রাজনীতির খাতিরে শরীয়তের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন, তার বিধান পরিবর্তন করেন। শরীয়তের আইন অমান্য ক'রে নিজেদের গদি টিকিয়ে রাখেন।

২। আদর্শচ্যুত আলেম। এঁরা শরীয়তের উপরে নিজেদের রায় ও যুক্তিকে খেয়াল-খুশী মতো প্রাধান্য দেন। কুরআন-হাদীসের সুবিধামতো ব্যাখ্যা ক'রে হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করেন।

৩। ইল্মহীন আবেদ। এঁরা অজ্ঞতা ও ভ্রষ্টতার সাথে আল্লাহর ইবাদত করেন। এঁদের অনেকে 'যওক', 'কাশ্ফ', 'খেয়াল' ও স্বপ্ন থেকে শরীয়ত গ্রহণ করেন এবং সে মতে আল্লাহর ইবাদত করেন।

স্বেচ্ছাচারী রাষ্ট্রনেতা বলেন, 'ধর্মনীতির সাথে রাজনীতির সংঘর্ষ বাধলে, রাজনীতি প্রাধান্যযোগ্য।

আদর্শ্যচ্যুত যুক্তিবাদী আলেম বলেন, 'কুরআন-হাদীস ও যুক্তির সংঘর্ষ বাধলে যুক্তিই

প্রাধান্যযোগ্য।'

সূফীমার্কা জাহেল আবেদ বলেন, 'শরীয়ত এবং যওক ও কাশ্‌ফের বিরোধ বাধলে যওক ও কাশ্‌ফই প্রাধান্যযোগ্য।

এঁরা সকলেই ইসলামের দরদে মায়াকান্না প্রকাশ করলেও আসলে কিন্তু সে দরদ নেই। যেহেতু তাঁদের কাছে শরীয়ত আসলে অহী-ভিত্তিক নয়; বরং যুক্তি-ভিত্তিক।

অথচ কোন অহীর উপর যুক্তি বা বিবেক প্রাধান্য পাওয়ার কথা নয়; যদিও অহীকে বরণ ও স্বীকার করার পথ বিবেকই রচনা করেছে।

উদাহরণ স্বরূপ যুক্তির সাথে (অহীর) উক্তি জাহেল মুকাল্লিদের সাথে আলেম মুজতাহিদের মত; বরং তারও নিম্নে। কারণ জাহেল শিক্ষা লাভ ক'রে আলেম হতে পারে, কিন্তু আলেম নবী হতে পারেন না। জাহেল মুকাল্লিদ কোন মুজতাহিদ আলেমের খবর পেল এবং অন্য এক জাহেলকে সে খবর দিল। সুতরাং প্রথম জাহেল হল রাহবার এবং দ্বিতীয় জাহেল হল ফতোয়া তলবকারী। আর আলেম হলেন মুফতী। এবার কোন বিষয়ে রাহবার ও মুফতীর যদি মতবিরোধ হয়, তাহলে ফতোয়া তলবকারীর উচিত মুফতীর কথা মান্য করা, রাহবারের কথা নয়। এখন রাহবার যদি বলে, 'আমার কথা মানো, আমার কথাটাই ঠিক। মুফতীর কথা ঠিক নয়; কারণ আমিই তোমাকে মুফতীর খবর দিয়েছিলাম। আমার কারণেই তুমি মুফতী চিনতে পেরেছ। অতএব আমাকে ছেড়ে তার কথা মানবে কেন? আমিই তো মূল। মূল ছেড়ে শাখাকে প্রাধান্য দেবে কেন?'

তাহলে ফতোয়া তলবকারী অবশ্যই রাহবারকে বলবে যে, 'তুমি যখন প্রথমে সাক্ষ্য দিয়েছ যে, উনি মুফতী। উনার কথা মেনে চলা ওয়াজেব। এখন তোমার এই কথা মেনে নেওয়ার মানে এ নয় যে, তোমার সব কথাকেই মানতে হবে। বরং মুফতীর কথাই তো মান্য, যেহেতু তিনি তোমার থেকে বেশী জ্ঞান রাখেন।'

বলা বাহুল্য, মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক হল রাহবারের মত। আর মুফতী হল কুরআন ও সহীহ হাদীস। ফতোয়া তলবকারী প্রত্যেক মুসলিমের উচিত, প্রত্যেক বিষয়ে রাহবারের কথা না মেনে মুফতীর কথা মানা; যদিও রাহবার তার কাছে তুচ্ছ নয়।

ইবনুল কাইয়েম (রঃ) বলেন,

لا يستقل العقل دون هداية ... بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا

كالطرف دون النور ليس بمدرك ... حتى يراه بكرة وأصيلا

وإذا الظلام تلاطمت أمواجه ... وطمعت بالإبصار كنت محيلا

فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها ... فالعقل لا يهديك قط سبيلا

نور النبوة مثل نور الشمس ... للعين البصيرة فاتخذه دليلا

طرق الهدى مسدودة إلا على ... من أم هذا الوحي والتنزيلا

فإذا عدلت عن الطريق تعمدا ... فاعلم بأنك ما أردت وصولا

يا طالبا درك الهدى بالعقل ... دون النقل لن تلق لذاك دليلا

كم رام قبلك ذاك من متلذذ ... حيران عاش مدى الزمان جهولا

অর্থাৎ, অহীর পথনির্দেশ ছাড়া জ্ঞান-যুক্তি স্বাতন্ত্র্য লাভ করতে পারে না; না মৌলিক ক্ষেত্রে, আর না বিশদ ক্ষেত্রে।

যেমন চক্ষু জ্যোতি ছাড়া সকাল-সন্ধ্যা দর্শন করতে পারে না।

অন্ধকারের ঘনঘটা তরঙ্গে তুমি দেখতে আগ্রহী হলেও (কিছু দেখা) তোমার জন্য অসম্ভব।

নবুঅতের আলো যদি তুমি না পেয়ে থাক, তাহলে জ্ঞান তোমাকে কখনই সঠিক পথ দেখাতে পারে না।

নবুঅতের আলো দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন চক্ষুর জন্য সূর্যের আলোর মত, সুতরাং তুমি তা পথিকৃত হিসাবে গ্রহণ কর।

হিদায়াতের সকল পথই বন্ধ, তবে তার জন্য নয়, যে এই অহী ও কুরআনকে অবলম্বন করে।

তুমি যদি সেই পথ হতে ইচ্ছাকৃত সরে যাও, তাহলে জেনে রেখো যে, তুমি আসলে গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে চাও না।

ওহে উক্তি ছাড়া যুক্তি দ্বারা হিদায়াত-সন্ধানী! উক্তি ছাড়া হিদায়াতের জন্য কোন রাহবার পাবে না।

তোমার পূর্বে কত লোক মজার সাথে বিমূঢ় হয়ে অনুরূপ চেষ্টা করেছে, কিন্তু সারা জীবন তারা অজ্ঞই থেকে গেছে।

আহলে সুন্নাহর একটি নীতি হল,

نحكم العقل بالوحى، وأن نفهم الوحى بالعقل إن تيسر ذلك.

অহী দ্বারা আমরা আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধিকে নিয়ন্ত্রিত করব এবং সম্ভব হলে জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা অহীকে বুঝার চেষ্টা করব।

মুসলিম বিচ্ছিন্নতা ও হাদীস

এতে কোন সন্দেহ নেই যে,হাদীসের সহীহ গ্রন্থগুলি লিপিবদ্ধ হওয়ার পূর্বে মুসলিম জাতি বহু ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল এবং প্রত্যেক ভাগই নিজ নিজ মতের সমর্থনে হাদীস ও কাহিনী বানিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু সহীহ গ্রন্থাবলী তথা মুহাদ্দিসীনদের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর সেসব জাল কাহিনী ও হাদীস চিহ্নিত হয়ে গেছে। প্রত্যেক দল সম্বন্ধে তাঁরা হকপন্থী মুসলিম উম্মাহকে সতর্ক ক'রে গেছেন। উল্লেখযোগ্য ফির্কাগুলোর মধ্যে মু'তাযিলা ফির্কা ছিল যুক্তিভিত্তিক আক্কেলমার্কা ফির্কা। তারাই আক্কেলের নিকষে সহীহ হাদীসকে অস্বীকার করেছে, কুরআনের আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা করেছে, আম্বিয়াগণের মু'জিযাকে অস্বীকার করেছে।

মু'তাযিলার মনুষ্যমেধার আকলানী মাদ্রাসায় যাঁরা প্রতিপালিত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে জামালুদ্দীন আফগানী, রশীদ রিযা, মুহাম্মাদ গাযালী, সার সাইয়েদ আহমাদ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। আর তাঁদেরই সুরে সুর মিলিয়েছেন আমাদের বাংলার আকরাম খাঁ ও তাঁর অনুসারীরা।

যেমন খাঁ সাহেবও তাদেরই মতো নিজের স্বাধীন চিন্তাধারা ও স্বেচ্ছাচারী জ্ঞান প্রয়োগের সমর্থনে হাদীস গড়ে অথবা গড়া হাদীস নকল ক'রে বলেছেন, *'মহানবী সঃ (বাইয়াত) প্রতিজ্ঞা গ্রহণকালে বলিয়াছেন, "আমি যাহা বলিব অন্ধের ন্যায় তাহার অনুসরণ করিবে না। তা সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত কথা কি না প্রথমে তাহা তাহ্‌কীক করিয়া লইবে। যদি তোমরা তাহাকে ন্যায়সঙ্গত কাজ বলিয়া মনে কর, তবেই তাহার অনুসরণ করিও।" (মোস্তফা চরিত ৪৬১-৪৬২পৃঃ, তত্ত্ব...... ১০ ও ১৫পৃঃ)*

অথচ এই শ্রেণীর কথা আবূ বাক্‌র ﷺ-এর বাইয়াত গ্রহণকালে তাঁর কথা বলে প্রসিদ্ধ আছে। পরন্তু তিনি এই শ্রেণীর কথা সর্বশ্রেষ্ঠ রসূলের প্রতি আরোপ ক'রে তাঁর মর্যাদা খর্ব করেছেন।

খাঁ সাহেব যদিও সহীহ হাদীস অস্বীকার করেন, কারণ তা তাঁর জ্ঞানের প্রতিকূলে; তবুও জাল

বা যয়ীফ হাদীস মানেন, কারণ তা তাঁর স্বাধীন চিন্তার সমর্থনে!

পক্ষান্তরে হকপন্থীরা মত অবলম্বন করার পর দলীল খোঁজেন না; বরং সহীহ দলীলে যা পান, সেটাই নিজেদের আকীদা ও আমল বলে বরণ করেন।

কুরআনের-হাদীসের উক্তির উপরে কোন যুক্তি প্রাধান্য পাবে না

শরীয়তের উপরে জ্ঞানের স্বাধীনতা নেই। মানুষের জ্ঞান সীমিত। স্বাধীন জ্ঞান নিয়ে চিন্তা ক'রে মানুষ সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার করেছে। নবী-রসূলকে অস্বীকার করেছে। কুরআনকে অস্বীকার করেছে। সুন্নাহকে অস্বীকার করেছে। জ্বিন-ফিরিশ্তা, মু'জিযা ও কারামতকে অস্বীকার করেছে? যে যুক্তি দিয়ে আল্লাহকে অস্বীকার করে, আর যে তার প্রমাণ করে, কোন্ যুক্তিটা ঠিক? দলীলের কাছে সকল যুক্তি অকেজো।

'তা সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত কি না তাহা তাহকীক করিয়া লইবে......' *(তত্ত্ব...... ১০ ও ১৫পৃঃ)* একি মহানবী ﷺ-এর উক্তি?

শরয়ী ব্যাপারে তাঁর এ উক্তি হতে পারে না। তাঁর এ উক্তি পার্থিব ব্যাপারে।

একদা তিনি সাহাবাদেরকে দেখলেন, তাঁরা খেজুর মোছার পরাগ-মিলন সাধন করছেন; অর্থাৎ, মাদা গাছের মোছা নিয়ে মাদী গাছের মোছার সাথে বেঁধে দিচ্ছেন। তিনি বললেন, "আমার মনে হয় ঐরূপ করাতে কোন লাভ নেই। ঐরূপ না করলেও খেজুর ফলবে।" তাঁর এ মন্তব্য শুনে সাহাবাগণ তা ত্যাগ করলেন। কিন্তু খেজুর ফলার সময় দেখা গেল, খেজুর পরিপুষ্ট হয়নি; ফলে তার ফলনও ভালো হয়নি। তিনি তা দেখে বললেন, "কী ব্যাপার, তোমাদের খেজুরের ফলন নেই কেন?" তাঁরা বললেন, যেহেতু আপনি পরাগ-মিলন ঘটাতে নিষেধ করেছিলেন, সেহেতু তা না করার ফলে ফলন কম হয়েছে। তিনি বললেন, "আমি ওটা ধারণা করে বলেছিলাম। তোমরা তোমাদের পার্থিব বিষয় সম্পর্কে অধিক জ্ঞান রাখ। অতএব তা ভালো হলে, তোমরা তা করতে পার।" *(মুসলিম ২৩৬১-২৩৬৩নং)*

এ জন্যই পার্থিব ব্যাপারে আল্লাহ তাঁকে আদেশ ক'রে বলেছিলেন,

{وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ} (١٥٩) سورة آل عمران

অর্থাৎ, অর্থাৎ, তাদের সাথে পরামর্শ কর। *(সূরা আলে ইমরান ১৫৯ আয়াত)*

যার ফলে তিনি যুদ্ধ-বিগ্রহ ও পার্থিব ব্যাপারে সাহাবাগণের রায় নিতেন। পক্ষান্তরে শরয়ী ব্যাপারে 'নবী'র জায়গায় তাঁদের 'রাসূল' শব্দও গ্রহণ করতেন না।

কুরআনে বৈজ্ঞানিক তথ্য আছে, বিজ্ঞানের সাথে তার সংঘর্ষ নেই। তা বলে কুরআন বৈজ্ঞানিক তথ্য পরিবেশন করার জন্য অবতীর্ণ হয়নি। আল্লাহর নবী ﷺ ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, পার্থিব চাকচিক্যের উন্নয়ন শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রেরিত হননি। তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন চারিত্রিক ও পারত্রিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য, পারলৌকিক জীবনকে উন্নত থেকে উন্নততর করার জন্য। আর এ জন্য পার্থিব কোন নতুন কাজ বিদআত নয়। সুতরাং তাঁর পার্থিব বিষয়ের কোন রায় ইত্যাদি পার্থিব দৃষ্টিতে বিবেচ্য হতে পারে, কোন শরয়ী ব্যাপার নয়। এই জন্য তিনি বলেছিলেন, "দুনিয়ার ব্যাপারে কোন ধারণাপ্রসূত কথা বললে, তা গ্রহণ করো না (যেহেতু আমি একজন মানুষ)। কিন্তু যখন আল্লাহর তরফ থেকে কোন কথা বলব, তখন তা গ্রহণ কর। যেহেতু আমি আল্লাহর ব্যাপারে কখনই মিথ্যা বলব না।" (আর তখন তা প্রত্যাখ্যান করার কোন যুক্তি

খাটবে না।) *(মুসলিম ২৩৬১-২৩৬৩)*

সুতরাং শরয়ী ব্যাপারে তাঁর কথাকে 'তাহকীক' ক'রে দেখে নেওয়ার অবকাশ কারো থাকতে পারে না। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا} (٣٦) سورة الأحزاب

অর্থাৎ, আল্লাহ ও তাঁর রসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন বিশ্বাসী পুরুষ কিংবা বিশ্বাসী নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। কেউ আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের অবাধ্য হলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে। *(সূরা আহযাব ৩৬ আয়াত)*

পক্ষান্তরে দ্বীন ও দুনিয়ার ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} (٦) سورة الحجرات

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! যদি কোন পাপাচারী তোমাদের নিকট কোন বার্তা আনয়ন করে, তাহলে তোমরা তা পরীক্ষা ক'রে দেখবে; যাতে অজ্ঞতাবশতঃ তোমরা কোন সম্প্রদায়কে আঘাত না কর এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও। *(সূরা হুজুরাত ৬ আয়াত)*

আর রসূল তো রসূলই! রসূলের খবর তাহকীক করতে হলে, কার কথা দিয়ে তার তাহকীক করবেন? বস্তুবাদী ও বাস্তববাদীদের কথা দিয়ে?

যদি কুরআন দিয়ে করেন, তাহলেও কোন সহীহ হাদীস কুরআনের বিপরীত হতে পারে না। অবশ্য ব্যাখ্যা স্বরূপ অনেক হাদীস কুরআনের বিধানের উপর অতিরিক্ত বিধান দেওয়া হয়েছে। আর তাও দ্বিতীয় অহী; যেমন অন্যত্র আলোচিত হয়েছে।

পক্ষান্তরে "আমার পক্ষ থেকে যা তোমাদের নিকট আসবে, তা আল্লাহর কিতাবের উপর পেশ কর। অতঃপর যে কথা কুরআনের অনুসারী হবে, তা আমার কথা। আর যা তার বিরোধী হবে, তা আমার কথা নয়।"---এ হাদীস এবং এই শ্রেণীর আরো হাদীসগুলি জাল। *(দেখুন সিলসিলাহ যায়ীফাহ ৩/২০৯)*

এই শ্রেণীর হাদীস 'যিন্দীক' (জরথুস্ত্রপন্থী)দের মনগড়া তৈরি। পক্ষান্তরে সহীহ হাদীসে এসেছে, মহানবী ﷺ বলেছেন, "শোন! আমাকে কুরআন দান করা হয়েছে এবং তারই সাথে তারই মত (সুন্নাহ) দান করা হয়েছে। শোন! সম্ভবতঃ নিজ গদিতে বসে থাকা কোন পরিতৃপ্ত লোক বলবে, 'তোমরা এই কুরআনের অনুসরণ কর; তাতে যা হালাল পাও, তাই হালাল মনে কর এবং তাতে যা হারাম পাও, তাই হারাম মনে কর। অথচ আল্লাহর রসূল যা হারাম করেন তাও আল্লাহর হারাম করার মতই।---" *(আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ, দারেমী, মিশকাত ১৬৩নং)*

অহীর উপরে কোন যুক্তি বা রায়ের চাকা সচল নয়। সেই জন্য সলফগণ সে ব্যাপারে সতর্ক করেছেন এবং যুক্তিবাদী বিদআতীদের ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহকে সাবধান করেছেন।

আলী ؓ বলেছেন, 'রায় বা যুক্তি দ্বারা যদি দ্বীন প্রমাণিত হত, তাহলে মোজার উপরের অংশ অপেক্ষা নিচের অংশই মাসাহর অধিক উপযুক্ত ছিল। কিন্তু আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে মোজার উপরের অংশে মাসাহ করতে দেখেছি।' *(আবূ দাউদ ১৬২,বাইহাকী ১/২২৯, দারেমী ৭১৫নং)*

হাজারে আসওয়াদকে চুম্বনকালে উমার ফারূক ؓ এই তত্ত্বকেই সামনে রেখে বলেছিলেন, 'আমি জানি যে, তুমি একটি পাথর; তুমি না কারো উপকার সাধন করতে পার, আর না-ই কারো অপকার। যদি রসূল ﷺ-কে তোমাকে চুম্বন করতে না দেখতাম, তাহলে আমি তোমাকে চুম্বন

করতাম না।' *(বুখারী ১৫৯৭নং)*

আওযায়ী বলেন, 'তুমি সলফের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চল; যদিও লোকে তোমাকে প্রত্যাখ্যান করে। আর এঁর-ওঁর রায় থেকে দূরে থাক; যদিও কথা দ্বারা তা তোমার জন্য সুশোভিত করে পেশ করে।' *(আশ্-শারীআহ ৬৩পৃঃ)*

যে সকল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি উক্ত প্রকার বিদআতে জড়িত হয়ে পড়ে, তারা তিনের মধ্যে এক অবশ্যই হবে ঃ-

হয়তো সে এমন লোক হবে, যার তরীকা ভালো, মযহাব উত্তম, যে শান্তি পছন্দ করে এবং যে সরল পথে স্থির থাকতে চেষ্টা করে বলে আপনি জানেন। কিন্তু তার কর্ণকুহরে তাদের কথা গুঞ্জরিত হয়েছে, যাদের হৃদয়ে শয়তানের বাসা আছে এবং তার ফলে তারা তাদের জিভে নানাবিধ কুফরী কথা বলে থাকে। আর সে ঐ জড়িয়ে পড়া বিদআতের গোলকধাঁধা থেকে বের হওয়ার পথ জানে না। তখন তার প্রশ্ন হয় জানার জন্য, পথ পাওয়ার জন্য। যে প্যাঁচে সে পড়েছে সে প্যাঁচ থেকে বের হওয়ার পথ অনুসন্ধান করে এবং যে রোগে সে ক্লিষ্ট হয়েছে সেই রোগ থেকে আরোগ্য লাভের ওষুধ খোঁজ করে। পরন্তু আপনি তার আনুগত্যের কথা অনুভব করেন এবং তার বিরোধিতা করা থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করেন, তাহলে এই হল সেই ব্যক্তি যাকে বাধা দেওয়া এবং শয়তানের চক্রান্ত-রশি থেকে বাঁচিয়ে সুপথ প্রদর্শন আপনার জন্য ফরয। আর আপনি যার মাধ্যমে তাকে পথ দেখাবেন ও জ্ঞানদান করবেন তা যেন কিতাব ও সুন্নাহ হয় এবং সাহাবা ও তাবেঈন তথা মুসলিম উম্মাহর সহীহ আসার হয়। তবে সে পথ প্রদর্শন যেন হিকমত ও সদুপদেশের সাথে হয়।

যে বিষয় আপনি জানেন না, সে বিষয়ে তাকাল্লুফ (কষ্টকল্পনা) করা থেকে, কোন রায় নিজের তরফ থেকে ব্যক্ত করা থেকে এবং অতি সূক্ষ্ম বিষয়ে মনোনিবেশ করা হতে দূরে থাকুন। কারণ এরূপ করা আপনার কর্মে বিদআত বলে পরিগণিত। আর যদি আপনি উক্ত কর্মের মাধ্যমে সুন্নাহ প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছা পোষণ করে থাকেন, তাহলে জেনে রাখুন যে, হকের পথ ব্যতিরেকে হক প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা হল বাতিল এবং সুন্নাহর তরীকা ছাড়া সুন্নাহর কথা বলা হল বিদআহ। আর নিজেকে রোগাক্রান্ত করে আপনি আপনার সঙ্গীর আরোগ্য অন্বেষণ করবেন না এবং নিজেকে খারাপ করে তাকে ভালো করার চেষ্টাও নয়। কারণ, যে নিজেকে ধোঁকা দেয়, সে অপরের জন্য হিতাকাঙ্ক্ষী হতে পারে না এবং যার মধ্যে নিজের জন্য কোন মঙ্গল নেই, তার মধ্যে অপরের জন্যও কোন মঙ্গল থাকতে পারে না।

বলা বাহুল্য, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে তাওফীক দান করেন এবং সঠিক পথে পরিচালিত করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে চলে, আল্লাহ তাকে সাহায্য ও মদদ করে থাকেন।' *(আল-ইবানাহ, ইবনে বাত্তাহ ২/৫৪০-৫৪১, ৬৭৯নং)*

ইউনুস বিন উবাইদ একদা তাঁর ছেলেকে বলেন, 'আমি তোমাকে ব্যভিচার, চুরি ও মদ্যপান করা হতে নিষেধ করছি। কিন্তু আম্র বিন উবাইদ ও তার সাথীদের (বিদআতী) রায় নিয়ে আল্লাহ আয্যা অজাল্লার সাথে সাক্ষাৎ করার চাইতে ঐ সকল পাপ নিয়ে সাক্ষাৎ করা আমার নিকট অপেক্ষাকৃত বেশী পছন্দনীয়।' *(ঐ ২/৪৬৬, ৪৬৪নং)*

আওয়াম বিন হাওশাব তাঁর ছেলে ঈসার জন্য বলেন, 'আল্লাহর কসম! ঈসাকে তর্কপ্রিয় বিদআতীদের সাথে ওঠা-বসা করতে দেখার চেয়ে তাকে বায়েন, মাতাল ও ফাসেক দলের সাথে ওঠা-বসা করতে দেখা আমার নিকট অপেক্ষাকৃত বেশী পছন্দনীয়।' *(আল-বিদাউ অন্-নাহয়ু আনহা, ইবনে অয্যাহ ৫৬পৃঃ)*

ইসলাম যুক্তির ধর্ম। সহীহ দলীল না পাওয়া গেলে যুক্তি প্রয়োগ করবেন উলামাগণ। অথবা দুই সহীহ দলীলে পরস্পর-বিরোধ ধারণা হলে যুক্তি প্রয়োগ করবেন উলামাগণ। সহীহ দলীলকে

প্রয়োগ করার জন্য যুক্তি ব্যবহার করবেন উলামাগণ। সহীহ দলীলকে উড়িয়ে দেওয়ার জন্য তাঁরা ভাঙ্গা কুলোর বাতাস ব্যবহার করবেন না।

সুন্নাহর মূল্যমান

নূর আলম সাহেব বলেন, *'প্রায় তিনশ বছর পরে হাদীস নামক (?) গ্রন্থগুলি রচিত হয়েছে।' (তত্ত্ব......৫০পৃঃ)*

তার মানে এই নয় যে, হাদীসগুলি পচা গুদামে পড়ে ছিল। আসলে যেভাবে কুরআন লেখা হত, সেইভাবে সুন্নাহ বা হাদীস লেখা হলে, কুরআন ও সুন্নাহর মাঝে গোলমাল ও সংমিশ্রণ হওয়ার বড় আশঙ্কা ছিল। আর তাতে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে সন্দেহ প্রবেশ করার ভয় ছিল। আর তার জন্যই মহানবী ﷺ নিজে কুরআন ছাড়া অন্য কিছু লিখতে নিষেধও করেছিলেন। *(মুসলিম ৭৭০২নং)*

অবশ্য এ নিষেধ ছিল শুরুর দিকে। পরে লেখার অনুমতি দেওয়া হয়। বিশেষ ক'রে যাঁদের ব্যাপারে দুটি অহীর মাঝে গোলমাল সৃষ্টি করার ব্যাপারে কোন সন্দেহ ছিল না, তাঁদেরকে সুন্নাহ লেখারও অনুমতি দেওয়া হয়। প্রমাণিত যে, তিনি কাউকে কাউকে সুন্নাহ লিখে দিতে আদেশও করেছেন এবং অনেক সাহাবীর কাছে অনেক সুন্নাহ লিখিত অবস্থাতেও সংরক্ষিত হয়। (প্রায় ৫২ জন সাহাবীর কাছে বহু হাদীস লিখিত অবস্থায় পাওয়া যায়।) পরবর্তীকালে কুরআন গ্রন্থাকারে সঞ্চিত হয়ে গেলে সে ভয় একেবারেই দূর হয়ে যায়। আর তারপরেই শুরু হয় সুন্নাহ লেখার তৎপরতা। *(দ্রঃ আস্-সুন্নাহ অমাকানাতুহা)*

অবশ্য বুখারী-মুসলিম প্রভৃতি সহীহ গ্রন্থ প্রায় ২০০ বছর পরে রচিত হলেও, তার মানে এই নয় যে, হাদীসগুলি ভুঁইফোঁড় হয়ে উচক্কা প্রকাশ পেয়েছে। কুরআন যেমন শুরুর দিকে হাফেযদের বুকে ও লেখকের লেখায় সংরক্ষিত ছিল এবং পরবর্তীতে তৃতীয় খলীফার আমলে গ্রন্থাকারে প্রকাশ পেল, তেমনি হাদীসও সুরক্ষিত ছিল এবং সঙ্গত কারণেই 'সহীহ'রূপে পরবর্তীতে প্রকাশ পেল।

কুরআন-বিরোধী মনে হলেই হাদীস অমান্য নয়। সামঞ্জস্য সাধন করেন উলামাগণ।

কুরআনী আয়াতের মাঝে পরস্পর-বিরোধিতা ধারণা হলে কী হয়?

কুরআনী আয়াত যদি জ্ঞান-বহির্ভূত হয়, তাহলে যেমন ধানাই-পানাই অপব্যাখ্যা চলে না, তেমনি সহীহ হাদীসও।

কুরআন-ভিত্তিক যুক্তিবাদীদের জেনে রাখা দরকার যে, পাশাপাশি সুন্নাহ-ভিত্তিক যুক্তি আবশ্যক। তা না হলে এক চাকায় বাইক অচল হয়ে যাবে। কুরআন কেবল কুরআনের উপরই ভরসা করতে বলে না। কুরআন সুন্নাহ তথা হাদীসের উপরেও ভরসা করতে বলে। পাঠকের অবগতির জন্য সেই উক্তির কিছু নিম্নে উদ্ধৃত হল ঃ-

মহান আল্লাহ বলেন,

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى (١) مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى (٢) وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى (٤) عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى (٥) سورة النجم

অর্থাৎ, শপথ নক্ষত্রের, যখন তা অস্তমিত হয়। তোমাদের সঙ্গী বিভ্রান্ত নয়, বিপথগামীও নয় এবং সে মনগড়া কথাও বলে না। তা তো অহী, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়। তাকে শিক্ষা দান করে চরম শক্তিশালী, (ফিরিশ্তা জিব্রাঈল)। *(সূরা নাজ্ম ১-৫ আয়াত)*

{وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ } (٤٤)

অর্থাৎ, তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি, যাতে তুমি মানুষকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দাও, যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং যাতে তারা চিন্তা-গবেষণা করে। *(সূরা নাহল ৪৪ আয়াত)*

{وَأَنزَلَ اللّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا}

অর্থাৎ, আল্লাহ তোমার প্রতি কিতাব ও প্রজ্ঞা অবতীর্ণ করেছেন এবং তুমি যা জানতে না, তা তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। আর তোমার প্রতি আল্লাহর মহা অনুগ্রহ রয়েছে। *(সূরা নিসা ১১৩ আয়াত)* আর হিকমত ও প্রজ্ঞা হল সুন্নাহ।

{قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ} (٥٤) سورة النور

অর্থাৎ, বল, 'আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রসূলের আনুগত্য কর।' অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তার উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য সে দায়ী এবং তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তোমরা দায়ী। তোমরা তার আনুগত্য করলে সৎপথ পাবে। আর রসূলের দায়িত্ব তো কেবল স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেওয়া। *(সূরা নূর ৫৪ আয়াত)*

{مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا} (٨٠)

অর্থাৎ, যে রসূলের আনুগত্য করল, সে আসলে আল্লাহরই আনুগত্য করল। আর যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আমি তাদের উপর তোমাকে প্রহরীরূপে প্রেরণ করিনি। *(সূরা নিসা ৮০ আয়াত)*

{قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}

অর্থাৎ, বল, 'তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর। ফলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' *(সূরা আলে ইমরান ৩১ আয়াত)*

{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}

অর্থাৎ, রসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করেন, তা হতে বিরত থাক। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর। *(সূরা হাশর ৭ আয়াত)*

{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا}

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহর (চরিত্রের) মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। *(সূরা আহযাব ২১ আয়াত)*

{فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا} (٦٥) سورة النساء

অর্থাৎ, কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা বিশ্বাসী (মু'মিন) হতে পারবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারভার তোমার উপর অর্পণ না করে, অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে নেয়। *(সূরা নিসা ৬৫ আয়াত)*

{فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (٦٣)

অর্থাৎ, যারা তার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় অথবা কঠিন শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে। *(সূরা নূর ৬৩ আয়াত)*

আর মহানবী ﷺ বলেন, "শোন! আমাকে কুরআন দান করা হয়েছে এবং তারই সাথে তারই মত (সুন্নাহ) দান করা হয়েছে। শোন! সম্ভবতঃ নিজ গদিতে বসে থাকা কোন পরিতৃপ্ত লোক বলবে, 'তোমরা এই কুরআনের অনুসরণ কর; তাতে যা হালাল পাও, তাই হালাল মনে কর এবং তাতে যা হারাম পাও, তাই হারাম মনে কর। অথচ আল্লাহর রসূল যা হারাম করেন, তাও আল্লাহর হারাম করার মতই।---" *(আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ, দারেমী, মিশকাত ১৬৩নং)*

ইবনে আব্বাস ؓ প্রমুখাৎ বর্ণিত, বিদায়ী হজ্জে আল্লাহর রসূল ﷺ লোকেদের মাঝে খোতবা (ভাষণ) দিলেন। তাতে তিনি বললেন, "শয়তান এ বিষয়ে নিরাশ হয়ে গেছে যে, তোমাদের এই মাটিতে তার উপাসনা হবে। কিন্তু এতদ্ব্যতীত তোমরা যে সমস্ত কর্মসমূহকে অবজ্ঞা কর, তাতে তার আনুগত্য করা হবে---এ নিয়ে সে সন্তুষ্ট। সুতরাং তোমরা সতর্ক থেকো! অবশ্যই আমি তোমাদের মাঝে এমন জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি; যদি তা দৃঢ়তার সাথে ধারণ করে থাকো তবে কখনই তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না; আর তা হল আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর নবীর সুন্নাহ (কুরআন ও হাদীস)" *(হাকেম, সহীহ তারগীব ৩৬নং)*

সুতরাং যে তফসীরকারী তাহকীক করবেন, তাঁর উচিত নয়, নিজের রায় দ্বারা তফসীর লেখা বা প্রচার করা; যদি সেখানে সলফ কর্তৃক তফসীর বর্ণিত থাকে। আর নবী ﷺ কর্তৃক সহীহ সনদে তা বর্ণিত থাকলে তো তার বিপরীত কোন তফসীরই গ্রহণযোগ্য হবে না।

হকপন্থী মুসলিমদের মাঝে এ কথা অবিসংবাদিত যে, সহীহ সুন্নাহ শরীয়তের দ্বিতীয় উৎস। এ উৎস থেকেও মুসলিমদেরকে গায়বী বিষয়ে, আকীদাগত বিষয়ে, আহকামগত বিষয়ে, রাজনীতি, অর্থনীতি এবং অন্যান্য নীতি ও তরবিয়তগত জীবনের যাবতীয় বিষয়ে বিধান গ্রহণ করতে হবে। কোন যুক্তি, রায় বা ইজতিহাদের অসীলায় কোন অবস্থায় তা প্রত্যাখ্যান করা যাবে না।

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেছেন,

" لا يحل القياس والخبر موجود. "

অর্থাৎ, হাদীস থাকতে কোন কিয়াস বা অনুমিতি বৈধ নয়। *(আর-রিসালাহ ২/৬৭)*

উসূলের উলামাগণ বলেন,

" إذا ورد الأثر بطل النظر." " لا اجتهاد في مورد النص. "

অর্থাৎ, হাদীস এসে গেলে যুক্তি-বিবেচনা বাতিল। স্পষ্ট উক্তির সামনে কোন ইজতিহাদ চলবে না। *(মাউসূআতু উসূলিল ফিক্বহ ৫৬/৩২৫, সিলসিলাহ সহীহাহ ৫/৬১২)*

মোটকথা, কোন শরয়ী বিষয়ে বিবেচকদের উচিত, প্রথমতঃ তার যোগ্যতা অর্জন করা। অতঃপর কুরআন ও সুন্নাহকে পাশাপাশি রেখে উভয়-ভিত্তিক যুক্তিবাদী হওয়া। নচেৎ ভ্রষ্টতা স্বাভাবিক।

আর হ্যাঁ, 'হাদীস মানি' বলে ইচ্ছামতো মানলে হবে না। বরং যে হাদীস সহীহভাবে প্রমাণিত তার প্রত্যেকটা মানতে হবে; যদি না তা মনসূখ হয়।

সহীহ হাদীসের কোন ফায়সালা বাহ্যতঃ কুরআন-বিরোধী মনে হলে কী করবেন?

চট্ ক'রে তা অস্বীকার ক'রে বসলে হবে না যে, এটা হাদীস নয়।

উদাহরণ স্বরূপ আপনি হাদীস পড়লেন,

উমার ইবনে খাত্তাব ؓ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, "মৃত ব্যক্তিকে তার কবরের মধ্যে তার জন্য মাতম ক'রে কান্না করার দরুন শাস্তি দেওয়া হবে।" *(বুখারী ও মুসলিম,*

মিশকাত ১৭৪২নং) অন্য এক বর্ণনায় আছে, “যতক্ষণ তার জন্য মাতম ক’রে কান্না করা হয়, (ততক্ষণ মৃতব্যক্তির আযাব হয়)।”

অবশ্যই মনে সমস্যা দেখা দেবে ও মনে হবে যে, এ হাদীসটি কুরআনের পরিপন্থী। কারণ, মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} (١٦٤) سورة الأنعام

অর্থাৎ, প্রত্যেকেই স্বীয় কৃতকর্মের জন্য দায়ী হবে এবং কেউ অন্য কারো ভার বহন করবে না। *(সূরা আনআম ১৬৪ আয়াত)*

এখন হাদীসটির প্রতি সন্দেহ হলে তা তো সহীহ হাদীস, তাকে রদ করার উপায় নেই। সুতরাং সমন্বয়-সাধনের পথ অবলম্বন করতে হবে। দেখতে হবে হাদীসের ব্যাখ্যাতাগণ কী বলেছেন।

দেখা যাবে, তাঁরা হাদীসের প্রেক্ষাপট বর্ণনা-সহ তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, ঐ কান্নায় যদি মৃতব্যক্তির কোন প্রকার সহযোগিতা থাকে, তাহলে তার নিজস্ব কারণঘটিত অপরাধের ফলে তাকে কবরে আযাব ভোগ করতে হবে।

জাহেলী যুগে মৃতব্যক্তি মরার পূর্বে মাতম ক’রে কান্নার অসিয়ত ক’রে মরত, যাতে মরণের পরে তার চর্চা হয়।

অথবা মরণের পূর্বে সে তার আত্মীয়-স্বজনকে মাতম ক’রে কান্না করতে নিষেধ ক’রে মরেনি। তাতে সে শৈথিল্য প্রদর্শন করেছিল। অথচ সে জানত যে, তার পরিবারে মাতম ক’রে কান্নার রেওয়াজ আছে।

এর ফলে সে মহান আল্লাহর এই নির্দেশ পালন করেনি,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} (٦) سورة التحريم

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা কর অগ্নি হতে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে নির্মম-হৃদয়, কঠোর-স্বভাব ফিরিশ্তাগণ, যারা আল্লাহ যা তাদেরকে আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং তারা যা করতে আদিষ্ট হয়, তাই করে। *(সূরা তাহরীম ৬ আয়াত)*

তাছাড়া এই শ্রেণীর পাপ সেই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, যাতে বলা হয়েছে,

{لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلاَ سَاء مَا يَزِرُونَ}

অর্থাৎ, ফলে কিয়ামত দিবসে তারা বহন করবে তাদের পাপভার পূর্ণমাত্রায় এবং তাদেরও পাপভার যাদেরকে তারা অজ্ঞতা হেতু বিভ্রান্ত করেছে। দেখ, তারা যা বহন করবে, তা কতই না নিকৃষ্ট। *(সূরা নাহল ২৫ আয়াত)*

এই শ্রেণীর তাহকীক করলে সহীহ হাদীসকে রদ করার মত পর্যায় আসবে না।

ইবনুল কাইয়েম (রঃ) বলেন, ‘মুসলিমকে যা বিশ্বাস করা ওয়াজেব তা এই যে, আল্লাহর রসূল ﷺ-এর এমন কোন একটিও সহীহ হাদীস নেই, যা আল্লাহর কিতাবের পরিপন্থী হতে পারে। বরং আল্লাহর কিতাবের সাথে হাদীস হল তিন স্তরের ঃ-

প্রথম ঃ কুরআনের অনুসারী; কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য একই।

দ্বিতীয় ঃ কুরআনের ব্যাখ্যা; যা আল্লাহর উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে এবং ব্যাপক বর্ণনা নির্দিষ্ট করে।

তৃতীয় ঃ এমন এক বিধানের বর্ণনা, যার ব্যাপারে কুরআন নীরব আছে।

এই তিন শ্রেণীর সুন্নাহর মধ্যে কোন শ্রেণীকে প্রত্যাখ্যান করা বৈধ নয়। আর সুন্নাহর কোন চতুর্থ স্তরও নেই।.....

কুরআনের বাহ্যিক অর্থ বুঝে যদি মানুষ সুন্নাহ বর্জন করা বৈধ মনে করে, তাহলে এর ভিত্তিতে অধিকাংশ সুন্নাহ বর্জিত হবে এবং বিলকুল বাতিল গণ্য হবে।' *(আত্-তুরুকুল হিকামিয়্যাহ ১০১পৃঃ)*

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন, 'কোন অবস্থাতেই আল্লাহর রসূলের কোন সুন্নাহ আল্লাহর কিতাবের পরিপন্থী হতে পারে না। *(আর-রিসালাহ ৫৪৬পৃঃ)*

আমাদের সলফগণ হাদীস প্রত্যাখ্যান করাকে বড় নিন্দনীয় কাজ বলে গণ্য করেছেন। হাদীস বিরোধী বা হাদীসের বর্ণনাকারী কোন সাহাবী বিরোধী মন্তব্যকে ভ্রষ্টতা বলে বিবেচনা করেছেন।

আবূ ক্বিলাবাহ বলেন, যখন তুমি কোন ব্যক্তিকে কোন হাদীস বর্ণনা করবে এবং সে বলবে, 'এ কথা ছাড়ুন, কুরআনের কথা বলুন' তখন জেনে নেবে যে, সে একজন গোমরাহ লোক। *(ত্বাবাক্বাতু ইবনে সা'দ ৭/ ১৮৪)*

ইমাম যাহাবী উক্ত কথার টীকায় বলেন, আর যখন বিদআতী বক্তাকে বলতে দেখবে যে, 'কুরআন ও একক বর্ণনাকারীর বর্ণিত (খবরে ওয়াহেদ) ছাড়ো, তোমার জ্ঞান-বিবেক কী বলছে তাই মানো' তখন জেনে নেবে যে, সে আবূ জাহেল। যখন কোন তাওহীদী (অদ্বৈতবাদ বা সর্বেশ্বরবাদ) মতাবলম্বী (সূফী)কে বলতে দেখবে যে, '(হাদীস) বর্ণনা ও জ্ঞান-বিবেক ছাড় এবং রুচি ও আবেগ যা বলছে তাই কর' তাহলে জেনে নেবে যে, ইবলীস মানুষের বেশে আবির্ভূত হয়েছে অথবা সে মানুষের দেহে প্রবেশ করেছে। সুতরাং তাকে দেখে যদি তুমি ভয় পাও, তাহলে সেখান হতে পলায়ন কর। নচেৎ তাকে চিৎ করে ফেলে তার বুকে বসে তার উপর আয়াতুল কুরসী পড় এবং গলা টিপে তাকে (সেই ইবলীসকে) হত্যা কর। *(সিয়ারু আ'লামিন নুবালা' ৪/৪৭২)*

মুহাদ্দিস হাসান বিন আলী আল-বার্বাহারী বলেন, 'যখন তুমি কাউকে দেখ যে, সে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাহাবাবর্গের মধ্যে কোন সাহাবীর বিরুদ্ধে কটূক্তি করছে, তখন জেনে নিও সে ব্যক্তি প্রবৃত্তিপূজারী বিদআতী।' *(শারহুস্ সুন্নাহ, বার্বাহারী ১১৫পৃঃ ১৩৩ নং)*

তিনি আরো বলেন, 'যখন কাউকে শোনো যে, সে হাদীসের বিরুদ্ধে কটূক্তি করছে অথবা হাদীস প্রত্যাখ্যান করছে অথবা হাদীস ছাড়া অন্য কিছু মানতে চাচ্ছে, তখন তার ইসলামে সন্দেহ করো। আর সে যে একজন প্রবৃত্তিপূজক বিদআতী তাতে কোন সন্দেহই করো না।' *(ঐ ১১৫-১১৬পৃঃ, ১৩৪নং, শারহুস সুন্নাহ ৫১পৃঃ)*

বুখারী-মুসলিমের মর্যাদা

নূর আলমী যুক্তিবাদীরা বলেন, *'যাঁরা উক্ত হাদীস নামক (?) গ্রন্থগুলির মধ্য থেকে জাল-ভুল-যয়ীফ ইত্যাদি বের করেন অথচ তাঁরাই গ্রন্থগুলিকে সহীহ সাব্যস্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা করেন। এটা বড়ই যুক্তিহীন কর্ম।' (তত্ত্ব.....২৩পৃঃ)*

বটে যুক্তিবাদী! সোনা থেকে খাদ বের ক'রে খাঁটি সোনা ব্যবহার করা যুক্তিহীন কর্ম? ক্ষেত থেকে আগাছা বেছে ফেলে খাঁটি ফসল ব্যবহার করা অযৌক্তিক কর্ম? নাকি সোনা থেকে খাদ বের ক'রে পুরো সোনাটাও ফেলে দেওয়া যুক্তিহীন কর্ম? ক্ষেত থেকে আগাছা বেছে ফেলে পুরো ফসল বর্জন করা অযৌক্তিক কর্ম? কোনটা জ্ঞানীদের এবং কোনটা মূর্খদের কাজ?

নূর আলম সাহেব বলেন, *'ইতিহাস বিষয়ে যদি কোন গ্রন্থের মধ্যে জাল ও ভুল ধরা পড়ে, তাহলে সেই গ্রন্থটি আইনত সহীহ বলে দাবী করার অধিকার হারিয়ে বসে।' (তত্ত্ব.....২৩পৃঃ)*

আর যদি ভুল যে ধরেছে, তারই ভুল হয়, তাহলে? সে ভুল যদি ভাঙ্গা যায়, তাহলে?

বুখারী গ্রন্থের যে ভুল যুক্তিবাদীরা বের করেছেন, তা আসলে বহু পূর্বেই ভাঙ্গা হয়েছে। কিন্তু দেখা বা অধ্যয়ন করার তওফীক তো তাঁদের হয়নি। কেবল অনুবাদ পড়ে কি যুক্তিবাদী হওয়া যায়? কুরআনের তফসীর ও হাদীসের শারাহ না পড়ে কি কুরআন-হাদীস বুঝা যায়?

'মূল কোরআন শরীফ ও হাদীছ বুঝিতে সক্ষম নয়, অনুবাদের উপর নির্ভরশীল; অথবা কোরআন-সুন্নাহর কেবল বিভিন্ন অংশ বিশেষের জ্ঞানই শেষ সীমা---এই শ্রেণীর ধার করা বা আংশিক জ্ঞানের পুঁজি লইয়া যাহারা ইজতেহাদের ময়দানে অবতীর্ণ হয় তাহাদের কার্য অনধিকার চর্চা বৈ আর কিছুই নহে। এই শ্রেণীর অনধিকার চর্চার অভিলাষীদের সতর্ক করার জন্য ইমাম বোখারী (রঃ) পরবর্তী একটি পরিচ্ছেদে ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, ঐ শ্রেণীর লোকদের অস্তিত্ব মুসলিম সমাজের জন্য আল্লাহর আযাব বটে।' (বাংলা বুখারী শরীফ ৭/২১৩)

বুখারী উম্মুল কুরআন?

'কোরাণে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অন্য কোন গ্রন্থকে সহীহ জ্ঞান করলে তা কুরআনের সমকক্ষ বলে জ্ঞান হয়ে যায়---' (তত্ত্ব......২৪পৃঃ) যুক্তিবাদীদের এ যুক্তি অত্যুক্তি ছাড়া কিছু নয়। নবী ﷺ-কে আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ বলি, অতঃপর আবূ বাকর ﷛-কে যদি সর্বশ্রেষ্ঠ সাহাবী বলি, তাহলে তাতে কি আবূ বাক্রকে নবীর সমান জ্ঞান করা হয়? ইসলামের মনীষীগণ বলেন, 'আস্বাহ্হুল কুতুবি বা'দা কিতাবিল্লাহি স্বাহীহুল বুখারী।' অর্থাৎ, আল্লাহর কিতাবের পর সবচেয়ে সহীহ গ্রন্থ হল সহীহ বুখারী। যেমন তাঁরা বলেন, 'আফযালুন না-সি বা'দা রাসূলিল্লাহি আবূ বাক্র আস-স্বিদ্দীক্ব।' অর্থাৎ, আল্লাহর রসূল ﷺ-এর পরে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হলেন আবূ বাক্র সিদ্দীক ﷛। তাতে তো কোন প্রকার সমকক্ষতা পরিদৃষ্ট হয় না।

পক্ষান্তরে যে আলেমরা সহীহ বুখারীকে 'উম্মুল কুরআন' বা কুরআনের মা বলেন, *(তত্ত্ব......৩৫পৃঃ দ্রঃ)* তাঁরা নিশ্চয় জাহেল অথবা এটি ধারণাপ্রসূত একটি রটনা। কারণ হাদীসে সূরা ফাতিহাকেই উম্মুল কুরআন বলা হয়েছে, অন্য কিছুকে নয়।

বুখারী-মুসলিমের সমালোচনা

এ বিশ্বে এমন কোন কিতাব নেই যার বিষয়ে মানুষ সন্দেহ করেনি, তার সমালোচনা করা হয়নি। স্বয়ং আল্লাহর কিতাবকে মানুষ সন্দেহ করেছে, তার সমালোচনা করেছে। আল্লাহর কিতাবের পর মর্যাদায় রয়েছে দু'টি গ্রন্থ বুখারী ও মুসলিম। এ দুইয়ের সমালোচনা তো হবেই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ ব্যাপারে ঘরের চিরাগে ঘর পুড়েছে, অর্থাৎ অমুসলিমদের সাথে সাথ দিয়ে অথবা সায়ে সায় দিয়ে অথবা তাদের সমালোচনার খণ্ডন না করতে পেরে কিছু মুসলিম উলামাও উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের সমালোচনা করেছেন!

যাঁরা সহীহায়ন বুখারী-মুসলিমের সমালোচনা করেছেন, তাঁদেরকে আমরা দু'ভাগে ভাগ করতে পারি ঃ-

এক ঃ যাঁরা সহীহায়নের সনদের সমালোচনা করেছেন। আর তাঁদের জবাব ফাতহুল বারী ও শারহে নাওয়াবীতে দেওয়া হয়েছে।

দুই ঃ অধুনা বিশ্বের কিছু আলেম-উলামা, যাঁদের অধিকাংশ বিদআতী, আকলানী, ইবাযী ও শিয়াগণ সহীহায়নের বহু হাদীসকে সরাসরি অস্বীকার করেছেন। কারণ, সে সকল হাদীস তাঁদের মযহাবের, মতের ও আক্কেলের অনুকূলে নয় তাই। আর তাঁদেরই ভাইরাস সংক্রমিত হয়েছে কিছু হিদায়াতী উলামার মাঝেও, ফলে তাঁদের দেখাদেখি প্রাচীনতার মাঝে আধুনিকতা প্রদর্শনের

প্রয়াসে সহীহায়নে ভুল ও জাল হাদীস প্রমাণ ক'রে 'হাদীস-বাহাদুর' সাজতে চেয়েছেন!

পাশ্চাত্যের উন্নয়নমুগ্ধ কিছু আলেম তাদের স্বেচ্ছাচারী চিন্তাধারায় প্রভাবান্বিত হয়ে সহীহায়নে নাপাক তীর মারলেও সে তীর উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের সুউচ্চ মর্যাদায় পৌছবে না। কারণ সে গ্রন্থদ্বয়ের অবস্থান হল আকাশের ঝলমলে তারকার মাঝে। আর সেদিকে থুথু মারলে সে থুথু নিজের গায়ে এসে পড়বে, তার দিকে ধুলো ছুঁড়লে সে ধুলো নিজের চোখে এসে পড়বে।

পক্ষান্তরে সহীহায়নের শ্লীলতাহানি করা নিশ্চয় কোন ছোট অপরাধ নয়, সহীহ সুন্নাহকে অবজ্ঞা করা নিশ্চয় কোন হাল্কা পাপ নয়। যে সুন্নাহকে মুসলিম উম্মাহ বরণীয় বলে মেনে নিয়ে আমল করছে, সেই সুন্নাহকে তাচ্ছিল্য করা কোন সহজ দুঃসাহসিকতা নয়।

সহীহায়নের মর্যাদার ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর অনুসরণীয় উলামাগণ কী বলেন শুনুন ঃ-

হাফেয আবূ নাস্‌র ওয়ায়েলী বলেন, 'আহলে ইল্‌ম তথা ফুকাহাগণ এ কথায় একমত যে, যদি কেউ কসম ক'রে বলে, 'বুখারীতে যত হাদীস এসেছে, তার সবগুলি সহীহ, নিঃসন্দেহে সেগুলি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর মুখনিঃসৃত বাণী, এ কথা সত্য না হলে আমার স্ত্রী তালাক।' তাহলে তার স্ত্রীর তালাক হবে না। *(উলূমুল হাদীস ২২পৃঃ)*

ইমামুল হারামাইন বলেন, যদি কেউ কসম খেয়ে বলে যে, 'বুখারী-মুসলিমে যত হাদীস এসেছে তার সবগুলি নবী ﷺ-এর উক্তি; তা না হলে আমার স্ত্রী তালাক।' তাহলে তালাক হবে না। যেহেতু উক্ত দুই কিতাবের সহীহ হওয়ার ব্যাপারে মুসলিমদের উলামাগণ একমত। *(তাদরীবুর রাবী ১/১৩১-১৩২)*

আবূ ইসহাক ইসফারাইনী বলেন, 'হাদীস-বিশেষজ্ঞগণ এ ব্যাপারে একমত যে, বুখারী-মুসলিমের 'উসূল' ও 'মতন'-এ যত হাদীস আছে, নিঃসন্দেহে তা সহীহ।' *(ফাতহুল মুগীস ১/৪৭)*

ইবনে স্বালাহও প্রায় একই কথা বলেন। *(দেখুন ঃ শারহুন নাওয়াবী ১/১৯)*

ইমাম নাওয়াবী বলেন, 'উলামা (রাহিমাহুমুল্লাহ)গণ এ ব্যাপারে একমত যে, কুরআনে আযীযের পর সবচেয়ে বেশী সহীহ কিতাব হল সহীহায়ন বুখারী ও মুসলিম। যেহেতু উম্মাহ (সহীহরূপে) তা বরণ ক'রে নিয়েছে।' *(ঐ ১/১৪)*

তিনি অন্যত্র বলেন, 'উম্মাহ এ ব্যাপারে একমত যে, এই কিতাবদ্বয় সহীহ এবং উভয়ের ভিত্তিতে আমল ওয়াজেব।' *(তাহযীবুল আসমা অল-লুগাত ১/৭৩)*

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেন, 'আকাশের নিচে কুরআনের পর বুখারী-মুসলিম ছাড়া অন্য কোন কিতাব সবচেয়ে বেশী সহীহ নয়।' *(মাকানাতুস সহীহায়ন ৬পৃঃ)*

হাফেয মুহাদ্দিস আল-আলাঈ বলেন, 'উম্মত এ ব্যাপারে একমত যে, বুখারী ও মুসলিম তাঁদের কিতাব সহীহায়নে সনদসহ যে সকল হাদীস বর্ণনা করেছেন, তার সবটাই সহীহ, তা পুনঃ বিবেচ্য নয়।' *(আন-নাক্বদুস সাহীহ, মুলতাক্ব আহলিল হাদীস ৮৮/৪৩৮ দ্রঃ)*

শায়খ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী বলেন, 'বুখারী-মুসলিমের ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ একমত যে, উভয় গ্রন্থে যে মুত্তাসিল মারফূ হাদীস রয়েছে, তা সুনিশ্চিতভাবে সহীহ। উক্ত গ্রন্থদ্বয় গ্রন্থকার পর্যন্ত মুতাওয়াতির। যে ব্যক্তি উভয়ের ব্যাপারে অবজ্ঞা প্রদর্শন করবে, সে ব্যক্তি বিদআতী এবং মু'মিনীনদের পথ ছেড়ে অন্য পথের অনুসারী।' *(হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ১/২৮৩)*

শায়খ আহমাদ শাকের বলেন, 'হাদীস বিষয়ক তাহকীককারী আহলে ইল্‌ম এবং দলীল দেখে তাঁদের পথ অনুসরণকারীদের নিকট সন্দেহহীন হক কথা এই যে, সহীহায়নের সমস্ত হাদীসই সহীহ। এর মধ্যে কোন একটি হাদীসের মধ্যে কোন খোঁচা মারা বা দুর্বলতার স্থান নেই। অবশ্য দারাকুত্বনী প্রমুখ কিছু হাদীসের হাফেযগণ তার কিছু হাদীসের সমালোচনা করেছেন।

আর তা এই অর্থে যে, তাঁরা উভয়ে সহীহর যে শর্তে গ্রন্থ রচনা করেছেন, সেই শর্ত সব হাদীসের ক্ষেত্রে পূরণ হয়নি; অর্থাৎ, সব হাদীসগুলি উচ্চ পর্যায়ের সহীহ নয়। পক্ষান্তরে হাদীস সহীহ হওয়ার ব্যাপারে কেউ মতবিরোধ করেননি।

সুতরাং রটনাকারীদের রটনা এবং ধারণাকারীদের ধারণা যেন আপনাকে শঙ্কিত না করে যে, সহীহায়নের হাদীস সহীহ নয়।' *(আল-বাইসুল হাসীস ২৯পৃঃ)*

ইমাম নাওয়াবী (রঃ)-এর অভিমত হল ঃ-

১। বুখারী-মুসলিমের হাদীসসমূহকে উম্মাহ সাদরে গ্রহণ ক'রে নিয়েছে।

২। উভয় গ্রন্থের সকল হাদীসের উপর আমল ওয়াজেব।

৩। গ্রন্থ দু'টি কুরআনে আযীমের পর সবচেয়ে বেশী সহীহ গ্রন্থ।

৪। পরবর্তীকালের উভয়ের সনদ নিয়ে কোন প্রকার চিন্তা-গবেষণার কোন প্রয়োজন নেই।

৫। মুতাওয়াতির না হলে উভয় গ্রন্থের হাদীস সুদৃঢ় ধারণা সৃষ্টি করে। *(দ্রঃ শারহে মুসলিম ১৪-১৯পৃঃ)*

নূর আলম স্বভাবী যুক্তিবাদীরা বলেন, *'আমাদের মনে রাখা উচিত ছিল যে, (মুহাম্মাদ বিন) ইসমাইল বুখারীও একজন মানুষ ছিলেন, সেহেতু তিনি কখনই নির্ভুল হতে পারেন না।' (তত্ত্ব......২৪পৃঃ)*

অতএব নির্ভুল, বুদ্ধিমান, বিজ্ঞ যুক্তিবাদীরা তাঁর গ্রন্থকে 'সহীহ' বলে মেনে নেবেন কেন? তা মানলে তো তাঁদের ভ্রান্ততা, অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতার পরিচয় হবে!

বুখারীও তো তাঁদের মতই একজন মানুষ। বুখারীর ভুল হতে পারে। তবে তাঁদের ভুল হতে পারে না।

হ্যাঁ, ভুলের উর্ধ্বে মানুষ নেই। কিন্তু বুখারী যে সকল কথা নকল করেছেন, তাতে তো আর ভুল থাকতে পারে না। যুক্তিবাদীদের জ্ঞানে ভুল থাকতে পারে, কারণ তাঁরাই বলেন, প্রত্যেক মানুষই ভুল করে। তাহলে ঠনঠনে জ্ঞানের উপর বিশ্বাস ভাল, নাকি সনদ-সম্বলিত একটি 'সহীহ' গ্রন্থের সেই হাদীসের বক্তব্যকে বিশ্বাস করা ভাল, যার বক্তা হলেন তিনি, যাঁর (শরীয়তের ব্যাপারে) কোন ভুল নেই?

সমস্ত সহীহ হাদীসের উপর আমল করা এবং যা যুক্তি-বহির্ভূত মনে হয় তার ব্যাখ্যা খোঁজা ভাল, নাকি খেয়াল-খুশী মতো সহীহ-যয়ীফের তমীয না ক'রে যেটা ইচ্ছা সেটাকে মানা এবং যেটা খুশী সেটাকে প্রত্যাখ্যান করা ভাল?

কারা বেশী বুদ্ধিমান, যাঁরা নিজেদেরকে বেশী বুদ্ধিমান মনে করেন এবং হাদীস বুঝতে না পেরে তা প্রত্যাখ্যান করেন তাঁরা, নাকি যাঁরা সহীহ হাদীসের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা রেখে আমল করেন তাঁরা? কারা প্রকৃত ঈমানদার?

নূর আলম সাহেব বলেন, *'কোরাণ বলে কোরাণের প্রতি বিশ্বাস রাখাটাই হল ইমানের কাজ। কোরাণ ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থকে বিশ্বাস করাটা ইমানদারের কাজ নয়।' (তত্ত্ব......৩৫পৃঃ)*

কুরআন কোথায় বলেছে যে, কুরআন ছাড়া অন্য কিতাবে বিশ্বাস করো না। কুরআন তো পূর্বেকার সমস্ত কিতাবে ঈমান রাখতে আদেশ করে। আমল রহিত হওয়ার কথা অথবা মানুষ কর্তৃক তা বিকৃত হওয়ার কথা আলাদা। পরন্তু হাদীসের কিতাবের ব্যাপারে কুরআন বলে,

{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}

অর্থাৎ, রসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করেন, তা হতে বিরত থাক। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর। *(সূরা হাশ্‌র ৭ আয়াত)*

আর বুখারী-মুসলিম ইত্যাদি কিতাবে বিশ্বাস ও আস্থা না রাখলে সে আদেশ পালন হবে

কিভাবে?

কুরআন বলেছে, তাতে আছে সবকিছুর বর্ণনা। কিন্তু হাদীস নিয়েই সবকিছুর বর্ণনা শামিল আছে। নচেৎ কুরআনে অনেক কিছুর বিস্তারিত বর্ণনা নেই। একটি হাদীসে এ কথা সুস্পষ্ট হবে,

ইবনে মাসউদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলতেন, '(হাত বা চেহারায়) দেগে যারা নকশা ক'রে দেয় অথবা করায়, চেহারা থেকে যারা লোম তুলে ফেলে (ভ্রূ চাঁছে), সৌন্দর্য আনার জন্য যারা দাঁতের মাঝে ঘসে (ফাঁক ফাঁক করে) এবং আল্লাহর সৃষ্টি-প্রকৃতিতে পরিবর্তন ঘটায় (যাতে তাঁর অনুমতি নেই) এমন সকল মহিলাদেরকে আল্লাহ অভিশাপ করুন।'

বনী আসাদ গোত্রের উম্মে ইয়াকূব নামক এক মহিলার নিকট এ খবর পৌঁছলে সে এসে ইবনে মাসউদ ﷺ-কে বলল, 'আমি শুনলাম, আপনি অমুক অমুক (কাজের) মহিলাদেরকে অভিশাপ করেছেন।' তিনি বললেন, 'যাদেরকে আল্লাহর রসূল ﷺ অভিশাপ করেছেন এবং যার উল্লেখ <u>আল্লাহর কিতাবে রয়েছে</u> তাদেরকে অভিশাপ করতে আমার বাধা কিসের?' উম্মে ইয়াকূব বলল, 'আমি (কুরআন মাজীদের) আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি, কিন্তু আপনি যে কথা বলছেন---তা তো কোথাও পাইনি।' ইবনে মসউদ ﷺ বললেন, 'তুমি যদি (গভীরভাবে) পড়তে, তাহলে অবশ্যই সে কথা পেয়ে যেতে। তুমি কি এ আয়াত পড়নি?'

{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا}

অর্থাৎ, রসূল তোমাদেরকে যা(র নির্দেশ) দেয় তা গ্রহণ (ও পালন) কর এবং যা নিষেধ করে তা হতে বিরত থাক।" *(সূরা হাশ্‌র ৭ আয়াত)*

উম্মে ইয়াকূব বলল, 'অবশ্যই পড়েছি।' ইবনে মাসউদ ﷺ বললেন, 'তাহলে শোন, তিনি ঐ কাজ করতে নিষেধ করেছেন।' মহিলাটি বলল, 'কিন্তু আপনার পরিবারকে তো ঐ কাজ করতে দেখেছি।' ইবনে মাসউদ ﷺ বললেন, 'আচ্ছা তুমি গিয়ে দেখ তো।'

মহিলাটি তাঁর বাড়ি গিয়ে নিজ দাবী অনুযায়ী কিছুই দেখতে পেল না। পরিশেষে ইবনে মাসউদ ﷺ তাকে বললেন, 'যদি তাই হত তাহলে আমি তার সাথে সঙ্গমই করতাম না।' *(বুখারী ৪৮৮৬নং, মুসলিম ২১২৫নং, আসহাবে সুনান)*

বুখারী শরীফে ভুল হাদীস

বুখারী-মুসলিমকে সন্দিগ্ধ কিতাব প্রমাণ করার মানসে সেই পূর্ব যুগেই 'যিনদীক' ও মু'তাযিলারা বেশ কিছু ভুল বের করার চেষ্টা করেছে, তা আসলে ঠিক 'দেখতে লারি চলন বাঁকা'র মতোই। আর সেই যুক্তি নিয়েই চর্বিত-চর্বণ করছেন বর্তমানের যুক্তিবাদীরা। এ ব্যাপারে বুখারীর অনুবাদক মাওলানা আজীজুল হক সাহেব বলেন, "খাঁ মরহুম তাঁহার এই অপচেষ্টার পথ পরিষ্কারে স্থায়ী ব্যবস্থারূপে তাঁহার মোস্তফা চরিত গ্রন্থের সুদীর্ঘ উপক্রমণিকার কয়েকটি পরিচ্ছেদ ব্যয় করিয়াছেন। তাতে তিনি দুইটি জঘন্য বিষ সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছেন। একটি হইল---মুসলিম জাতির গৌরব, ইসলামের শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সুরক্ষক, অতন্দ্র প্রহরী কুরআন-হাদীছ বিশেষজ্ঞ পূর্ববর্তী মহান ইমামগণকে শুধু উপেক্ষা ও কটাক্ষ করাই নহে; বরং তাহাদিগকে সমাজের নিকট পরিত্যাজ্য সাব্যস্ত করিবার জন্য অশালীন ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন। আর একটি হইল---মনীষী ইমামগণের জীবন সাধনালব্ধ মূল্যবান জ্ঞান-গবেষণার প্রতিও সমাজের আস্থা ভাঙ্গিয়া দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন।

তিনি তাঁহার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে মাকালরূপী কতকগুলি যুক্তি সত্যের আবরণীতে ব্যক্ত করিয়াছেন। সেই যুক্তিগুলির ভিতরেও বিষ ঢুকাইয়াছেন অনেক। যদ্দ্বারা তিনি সীমাহীন ধৃষ্টতায় পৌঁছিয়াছেন যে, তৃতীয় পরিচ্ছেদে পরিষ্কার ভাষায় ইসলাম ও মুসলিম জাতির গৌরব পূর্বতন

আলেম এবং ইমামগণ সম্পর্কে বলিয়াছেন- 'বোযর্গানে দ্বীন ও সলফে সালেহীন' বলিয়া মুসলমান সমাজে যেসকল 'তাগুতের' সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহাই হইতেছে সর্বনাশের মূল।

পাঠক! আপনারা ভাবিতে পারেন এবং মরহুম এই ধারণা সৃষ্টির অপচেষ্টা করিয়াছেনও বটে যে, তাঁহার কটাক্ষ ও আক্রোশ শুধু কল্পিত ও ভুয়া বুজুর্গদের সম্পর্কে এবং নবীজী সাঃ-এর জীবনী সংক্রান্ত রচিত অপ্রামাণিক উর্দু, ফার্সী চটি বই-পুস্তক সম্পর্কে সীমাবদ্ধ।

খাঁ মরহুমের পান্ডিত্য ও বাকপটুতার আবরণে অসংখ্য ধোঁকা-ফাঁকির ইহাও একটি। তাঁহার অসার পেঁচালো মন্তব্যসমূহে তিনি ঐরূপ হাবভাব দেখাইয়া এবং ঐ শ্রেণীর শব্দ ব্যবহার করিয়া সমাজের ধিক্কার ও ক্ষোভ হইতে গা-ঢাকা দেওয়ার মতলব করিয়াছেন মাত্র। প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার উদ্দেশ্যে ঐরূপ সীমাবদ্ধ নহে।

প্রথমতঃ পূর্ব যুগে 'ইমাম' আখ্যার ভুয়া কল্পিত পাত্র ছিল বলিয়া কোন ইতিহাস আমাদের জানা নাই। তবে আলেম ও পীর নামের ভুয়া লোক থাকা স্বাভাবিক। জগতের অন্যান্য শ্রেণীতেও তাহা আছে; যেমন, ডাক্তার, আইনজ্ঞ, বিভিন্ন প্রকাশক ইত্যাদিতেও ভুয়া ব্যক্তি আছে; সেই জন্য তাহাদিগকে শ্রেণীগতভাবে গালি দিয়া তাহাদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টির উক্তি কি ক্ষমার যোগ্য হইবে?........

দ্বিতীয়তঃ খাঁ মরহুম প্রকৃত প্রস্তাবে ভুয়া ও কল্পিত বুজুর্গ নামীয় চুনোপুঁটি আটকাইবার জন্য সুবৃহৎ উপক্রমণিকার জাল ফেলেন নাই; তিনি ইমাম বোখারী, ইমাম মুসলিমের ন্যায় বড় বড় মোহাদ্দেস, ইসলাম ও মুসলিম জাতির গৌরব---রুই-কাতলা আটকাইবার উদ্দেশ্যে ঐ জাল ফেলিয়াছেন। তিনি উর্দু-ফারসী চটি বই মুছিবার জন্য এত এত পান্ডিত্য ব্যয় করেন নাই। তিনি ৬০০-৭০০ বৎসর হইতে প্রচলিত ৪০০০-৬০০০ পৃষ্ঠায় রচিত সুপ্রসিদ্ধ মোহাদ্দেস ও মোফাসসেরগণের জ্ঞানগর্ভময় জাতীয় সম্পদ ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলীকে উপেক্ষণীয় ও প্রক্ষিপ্ত সাব্যস্ত করার কুমতলব আটিয়াছেন।".............

ক্ষোভ ও দুঃখের সীমা থাকিতে পারে কি? খাঁ মরহুম মাকড়সার জালের আশ্রয় লইয়া পাহাড়ের সহিত টক্কর দেওয়ার ন্যায় যেসব ছুতার আঁচল ধরিয়া বোখারী শরীফের হাদীছকে ভুল সাব্যস্ত করিয়াছেন, ঐসব কোনটাই তাঁহার আবিষ্কার নহে। মুসলিম জাতির ঈমানী বিশ্বাসকে শিথিল করিয়া তাহাদের দুর্বল করার সম্ভাব্য চেষ্টারূপে যেসব ছল-ছুতার জন্ম দেওয়া যাইতে পারে, উম্মতের হিতৈষীগণ পূর্ব আমলেই সেই সবের উদ্ঘাটন করিয়াছেন এবং বোখারী শরীফের গবেষণাকারীগণ নিজ নিজ রচনায় ঐ সবের ধূম্রজাল ছিন্ন করিয়া গিয়াছেন।

পন্ডিত খাঁ মরহুম কোথাও বিষজনিত ঐ সব ছল-ছুতার খোঁজ পাইয়াছেন; কিন্তু হাদীছ শাস্ত্রে তাঁহার জ্ঞান-গবেষণার দৌড় তাঁহাকে বোখারী শরীফের উল্লিখিত ব্যাখ্যা গ্রন্থসমূহ পর্যন্ত পৌঁছাইতে পারে নাই। ফলে তিনি ঐ বিষয়ে প্রতিষেধক হইতে বঞ্চিত থাকিয়া গিয়াছেন এবং বাংলাভাষী ভাইদের জন্য ঐ বিষ আমদানী করিয়াছেন। বাংলাভাষী পাঠক ভাইগণ হাদীছ শাস্ত্রের কী জ্ঞান রাখেন যে, তাঁহারা এই বিষয়ে প্রতিষেধক খোঁজ করিয়া বাহির করিবেন? আরও পরিতাপের বিষয়---ভাষা সম্রাট বাক্‌পটু পন্ডিত খাঁ মরহুম নিজ প্রতিভা দ্বারা বিষকে এমন সুন্দর সাজে সাজাইয়াছেন হাদীছ শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ বাংলাভাষী পাঠক তাহা গলাধঃকরণ করিবেই। সুতরাং খাঁ মরহুম তাঁহার এই অপকর্ম দ্বারা বাংলাভাষী মুসলিম সমাজের অপূরণীয় ক্ষতি করিয়াছেন; তাহাদের জন্য শুধু বিষের দোকান সাজাইয়া গিয়াছেন।

নবীগণের মোজেযা অস্বীকারের ন্যায় খাঁ মরহুম আরও অনেক সত্যকে অস্বীকার করিতেন। যথা---জ্বিন জাতির অস্তিত্ব, ইয়াজুজ-মাজুজ সম্পর্কীয় অনেক তথ্য; ঈসা আলাইহিস সালামের কোন কোন বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি। বোখারী-মুসলিম শরীফ এবং হাদীছ ভান্ডারের অনেক হাদীছ ঐ

সত্য অস্বীকার করার অন্তরায় হয়; সে বাধা অপসারণে খাঁ মরহুম বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফের ন্যায় মহাগ্রন্থাবলীকে ঘায়েল করার এই অপচেষ্টা করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন খাঁ মরহুমের তফসীর নামে পবিত্র কুরআনের অপব্যাখ্যা এবং 'মোস্তফা চরিত' পাঠ করিলে মনে হয় যেন বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফের ন্যায় মহাগ্রন্থসমূহের হাদীছ অস্বীকার ও ভুল সাব্যস্ত করিয়া তিনি বাহাদুরী দেখাইবার স্বাদ অনুভব করিতেন। যেমন, কেহ পিতাকে খুন করিয়া বিশ্ব-রেকর্ড স্থাপন করার আনন্দ উপভোগ করে।

বাংলা বোখারী শরীফ তৃতীয় ও চতুর্থ খন্ডে ঐরূপ কোন কোন হাদীছ অস্বীকার এবং তাহা খন্ডনের বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। এস্থলে সংক্ষেপে শুধু ঐ হাদীছ সম্পর্কে আলোচনা হইবে যাহা তিনি মোস্তফা চরিতের উপক্রমণিকায় তাঁহার কথিত হাদীছ 'পরীক্ষার নূতন ধারা' পরিচ্ছেদের ভুল হাদীসের নমুনারূপে পেশ করিয়া বলিয়াছেন 'সনদ সহীহ হওয়া সত্ত্বেও ঐ হাদীছগুলি নির্দোষ, প্রকৃত এবং সত্য হাদীছ বলিয়া কোন মতেই গৃহীত হইতে পারে না!'

বোখারী মুসলিম শরীফের হাদীছ সম্পর্কে এই দাবী যে, সত্য হাদীছ বলিয়া কোন মতেই গৃহীত হইতে পারে না; তাহাও নেহাত তুচ্ছ হেতুর অজুহাতে ইহা জঘন্য ধৃষ্টতা বৈ নহে।

খাঁ মরহুমের ভাষায় 'প্রথম প্রমাণ' অর্থাৎ বোখারী ও মুসলিম শরীফে যে ভুল হাদীছ রহিয়াছে তাহার প্রথম প্রমাণ বা নমুনা 'আনাছ রাঃ বলিতেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ....} (٢) سورة الحجرات

'হে মোমিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর আপনাদের স্বর উর্দ্ধে চড়াইও না.....।"

এই আয়াতটি নাযিল হইলে সাবেত বিন কায়েস ছাহাবীর খুব ভয় হইল; তাঁহার কণ্ঠস্বর স্বভাবতঃ খুব উচ্চ ছিল। তাই তিনি হযরতের খেদমতে উপস্থিত হন না, বাড়ীতে থাকেন। কয়েক দিন ঐভাবে অতীত হইলে হযরত (সঃ) সাদ বিন মোআয নামক ছাহাবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সাবেতকে দেখি না কেন, তাহার কি অসুখ হইয়াছে? সা'দ বিন মোআয সাবেতের বাড়িতে গমন করিলেন ও সাবেতকে হযরতের প্রশ্নের কথা জানাইলেন। সাবেত নিজের কণ্ঠস্বর ও সদ্য অবতীর্ণ উক্ত আয়াতের কথা উল্লেখ করিয়া নিজের নরকী হওয়ার আশঙ্কা জানাইলেন। সা'দ বিন মোআয সাবেতের আশঙ্কা প্রকাশ নবীজী সঃ কে জ্ঞাত করিলেন। তিনি বললেন, বরং সে বেহেশ্‌তী।'

খাঁ মরহুমের বক্তব্য, এই হাদীছটি সত্য হইতে পারে না। কারণ, ঘটনায় উল্লিখিত আয়াতটি নবম হিজরীতে নাযিল হয়, আর সা'দ বিন মোআযের মৃত্যু হিজরী পঞ্চম সনে।

পাঠকবর্গ! হাদীছখানাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার একটি ভিত্তি হইল, হাদীছটির আলোচ্য আয়াত নবম হিজরী সনে নাযিল হইয়াছে---এই বিষয়টি বিতর্কমূলক। প্রসিদ্ধ হাফেযে হাদীছ ইবনে হাজার (রঃ) ভিন্ন মতের অবকাশ দেখাইয়াছেন।

খাঁ মরহুম বোখারী শরীফ তফসীর অধ্যায়ের যে হাদীসের বরাত দিয়াছেন, বোখারী শরীফের উক্ত পৃষ্ঠায়ই হাফেয ইবনে হাজারের অবকাশ প্রকাশের সমর্থন বিদ্যমান রহিয়াছে। বিতর্কমূলক একটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া হাদীছকে অবাস্তব-অসত্য বলা ক্ষমাহীন অপরাধ নহে কি?

আরও একটি বিষয় সুস্পষ্ট হইল যে, ৬০০ শত বৎসর পূর্বে বোখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার হাফেয ইবনে হাজার (রঃ) যে প্রশ্নের খন্ডন করিয়া গিয়াছেন সেই প্রশ্নের মৃত লাশ বাহির করিয়া হাদীছ শাস্ত্রের অভিজ্ঞতাহীন বাংলাভাষী পাঠকদিগকে বিভ্রান্ত করা হইয়াছে---ইহা অপরাধ নহে কি?

হাফেয ইবনে হাজার (রঃ) যে ধারায় প্রশ্নের খন্ডন করিয়াছেন তাহা হাদীছ ও তফসীরের

শাস্ত্রীয় অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল। আমরা অন্য একটি সরল সহজ পয়েন্ট পেশ করিতেছি---তাহাও পূর্ব আমলের গবেষকগণই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

আলোচ্য হাদীছখানা বোখারী শরীফের দুই স্থানে ৫১০ ও ৭১৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে একই সনদ তথা সাক্ষ্য সূত্রে। মুসলিম শরীফে হাদীছখানা একই জায়গায় পর পর ৪টি সনদে বর্ণিত হইয়াছে। *(৩২৯-৩৩২নং হাদীস দ্রষ্টব্য)* অতএব হাদীছখানার মোট সাক্ষ্য সূত্র বা সনদ হইল পাঁচটি।

পাঠক! ইহা একটি মহা সত্য যে, হাদীছকে তাহার আসল জায়গায় সরাসরিভাবে গবেষণা না করিয়া শুধু ধার করা জ্ঞানে তথা উদ্ধৃতি বা অনুবাদ দেখিয়া কোন হাদীছ সম্পর্কে মুখ খোলা মহাপাপ। এই মহাপাপের পরিণাম এখানে লক্ষ্য করুন। মরহুম খাঁ সাহেব একজন বিশিষ্ট পন্ডিত ও স্বভাব-জ্ঞানী ছিলেন। তিনি বোখারী শরীফ মূল গ্রন্থ হইতে দূরে থাকিয়া শুধু উদ্ধৃতি দেখার ধার করা জ্ঞানে দূর হইতে ঢিল ছুঁড়িয়াছেন। নতুবা তিনি উল্লিখিত হাদীসের সমালোচনা করিতে বোখারী শরীফের নাম মুখে বা লেখনীতে আনিতেন না। কারণ, তাঁহার সমালোচনার দ্বিতীয় ভিত্তি ছিল হাদীছটির বর্ণনায় সা'দ বিন মোআযের উল্লেখ; যেহেতু তার মৃত্যু হিজরী পঞ্চম সনে। পাঠক শুনিয়া আশ্চর্যান্বিত হইবেন যে, বোখারী শরীফের দুই স্থানে হাদীছখানা বর্ণিত, কিন্তু তাহার কোন স্থানেই সা'দ বিন মোআযের নাম নাই। বরং আছে فقال رجل أنـا أعلـم অর্থাৎ, নবীজী (সঃ) সাবেত বিন কায়সের আলোচনা করিলে এক ব্যক্তি বলিল, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আপনার জন্য তাহার সংবাদ জানিয়া আসিব।'

পাঠক! লক্ষ্য করুন---সমালোচনার ভিত্তিটাই যখন বোখারী শরীফের হাদীসে বিদ্যমান নাই, তখন সমালোচনার ক্ষেত্রে এরূপ বলা যে, 'বোখারী ও মুসলিমে একটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে'---ইহা কতটুকু ঈমানদারী তাহা ভাবিয়া দেখিবেন।

তারপর আসুন! মুসলিম শরীফের হাদীছ খানার অবস্থা দেখুন! পূর্বেই বলা হইয়াছে, শুধু উদ্ধৃতি দেখার ন্যায় ধার করা জ্ঞানে হাদীছ সম্পর্কে কিছু বলা নিতান্তই অবান্তর। খাঁ মরহুমের সমালোচিত হাদীছখানা মুসলিম শরীফে চারটি সনদ তথা সাক্ষ্যসূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমে উল্লেখ হইয়াছে ঐ সাক্ষীর বর্ণনা যাহার বর্ণনায় খাঁ মরহুমের সমালোচনার ভিত্তি বস্তু তথা "সা'দ বিন মোআয" নাম বিদ্যমান রহিয়াছে। পাঠক আশ্চর্যান্বিত হইবেন, মুসলিম (রঃ) বিভ্রান্তি হইতে সতর্ক ও হুঁশিয়ার করার জন্য সঙ্গে সঙ্গে যে ব্যবস্থা রাখিয়াছেন তাহা হইতে খাঁ মরহুম নিজে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিয়া এবং পাঠককে অজ্ঞ রাখিয়া সেই বিভ্রান্তিতে নিজেও পতিত হইয়াছেন এবং অপরকেও পতিত করার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই কেলেঙ্কারির একমাত্র কারণ হইল মুসলিম শরীফ মূলগ্রন্থ দেখার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত থাকা।

দেখুন মুসলিম শরীফে বিভ্রান্তি অবসানের কী সুন্দর ব্যবস্থা রহিয়াছে। একটি সাক্ষীসূত্রে ঐ সমালোচনার বস্তু সম্বলিত বিবরণ উল্লেখের সাথে সাথেই ঐ হাদীছটির উপর তিনটি সাক্ষ্যসূত্র বর্ণিত রহিয়াছে। এই সাক্ষীগণের বর্ণনায় স্পষ্ট বলা হইয়াছে,

ليس في حديثه ذكر سعد بن معاذ- لم يذكر سعد بن معاذ.

"এই সাক্ষীর বর্ণনায় সা'দ বিন মোআযের উল্লেখ নাই। এই সাক্ষ্য সা'দ বিন মোআযের নাম উল্লেখ করেন নাই।" *(৩২৯-৩৩২নং হাদীস দ্রঃ)*

ইমাম মুসলিমের বর্ণনায় প্রতীয়মান হইল যে, মূল হাদীছটির তথ্য অসত্য বা অপ্রকৃত বলা যাইতে পারে না। কারণ, শুধু একজন সাক্ষীর বর্ণনায় একটি নাম উল্লেখের বিভ্রাট থাকিলেও অপর তিনজন সাক্ষীর বর্ণনায় ঐ বিভ্রাটমুক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে।

পাঠক! একটি ঘটনা সাব্যস্ত করিতে বাদী যদি পাঁচটি সাক্ষী পেশ করে---সে ক্ষেত্রে বিবাদী

একটি সাক্ষীর বর্ণনায় দোষ দেখাইতে পারিলে ঘটনাটি মিথ্যা হইয়া যাইবে? ইমাম মুসলিম বিভ্রাট খন্ডনের জন্য প্রথমে বিভ্রাটযুক্ত সাক্ষ্যসূত্র উল্লেখ করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গেই বিভ্রাটমুক্ত তিনটি সাক্ষ্যসূত্র উল্লেখ করিয়া প্রথমটির দোষ নির্ণয় এবং তাহার খন্ডন করিয়া দিয়াছেন। ইহা কি তাঁহার দোষ হইল?

মুসলিম শরীফের চারি সাক্ষ্যসূত্র এবং বোখারী শরীফের এক সাক্ষ্য সূত্র---এই পাঁচটি সাক্ষ্যসূত্রের একটি সাক্ষীর (মুসলিম শরীফের) বর্ণনায় যে সা'দ বিন মুআযের নাম উল্লেখের বিভ্রাট রহিয়াছে তাহাও অতি নগণ্য। সাহাবীগণের নাম পর্যালোচনায় দেখা যায়, সাহাবীগণের মধ্যে একজন ছিলেন সা'দ বিন মোআয, আর একজন ছিলেন সা'দ বিন ওবাদাহ।

আলোচ্য হাদীসের ঘটনার ব্যক্তি প্রকৃতপ্রস্তাবে ছিলেন সা'দ বিন ওবাদাহ, যাঁহার মৃত্যু নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অনেক পরে। সুতরাং তাঁহার নামের বেলায় কোন প্রশ্নের অবকাশ নাই। এখন ভাবিয়া দেখুন সাহাবীদের যুগে নহে; ইহার পরে; তথা ঘটনার অনেক বছর পরে একজন বিশিষ্ট জ্ঞানবান অতিশয় শ্রদ্ধাভাজন সা'দ নামও ঠিক বলিয়াছেন। শুধু কেবল বিন ওবাদাহ স্থলে বিন মোআয বলিয়া পিতার নাম ব্যতিক্রম বলিয়াছেন। ইমাম মুসলিম উক্ত সাক্ষীর বর্ণনা উল্লেখ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনজন সাক্ষীর বর্ণনা উল্লেখ করিয়া ঐ ব্যতিক্রমটা ধরাইয়াও দিয়াছেন। এখন শুধু ঐ ব্যতিক্রম পুঁজি করিয়া অন্য সব রকম দোষমুক্ত একটি সুদীর্ঘ হাদীসের সর্বময় বিবরণকে অপ্রকৃত ও অসত্য বলা এবং ইমাম মুসলিম কর্তৃক ব্যতিক্রমটা ধরাইয়া দেওয়ার কথা গোপন করিয়া বোখারী-মুসলিমে অসত্য হাদীছ আছে বলা কত দূর ঈমানদারী তাহা সুধীগণ বিচার করিবেন।

খাঁ মরহুম তাঁহার বিভিন্ন ভ্রান্ত মতবাদের জন্য পথ পরিষ্কারের উদ্দেশ্যে খেয়াল-খুশীমত হাদীছ এনকার-অস্বীকার করার জন্য 'পরীক্ষার নূতন ধারা' নামে একটি ফাঁদ তৈয়ার করিয়াছেন। মাকড়সার জালে তৈয়ারী সেই ফাঁদে তিনি বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফের ন্যায় শক্তিশালী গ্রন্থাবলীর হাদীছ আটকাইতে যাওয়া দশটি নমুনা প্রমাণরূপে পেশ করিয়াছেন। তাঁহার সবগুলি প্রলাপের উত্তর দিতে গেলে অহেতুক সময় অপচয়ের যাতনা পোহাইতে হয়।....হাদীস মোটেই না বুঝিয়া, এমনকি প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা গ্রন্থাবলীতে ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও মূলগ্রন্থ তলাইয়া দেখার যোগ্যতার অভাবে অজ্ঞ থাকায় যেসব প্রলাপের সৃষ্টি হইয়াছে তা দেখিলে ত গাত্রদাহ এবং ক্ষোভ ও ঘৃণা জন্মে।" *(বাংলা বোখারী শরীফ ৫খন্ড উপক্রমণিকা দ্রঃ)*

বুখারী-মুসলিম ছাড়া অন্যান্য গ্রন্থে জাল ও ভুল হাদীস যে আছে, তা কেউ অস্বীকার করে না। (কোন্ কোন্ কারণে হাদীস জাল হয়েছে, তা আমি আমার 'হাদীস ও সুন্নাহর মূল্যমান' পুস্তিকায় উল্লেখ করেছি।) বহু জাল হাদীস তফসীর গ্রন্থগুলোতে যে ঢুকানো আছে, তাও কেউ অস্বীকার করে না। কিন্তু তার সাথে এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, সে সকল জাল হাদীস চিহ্নিত করার জন্য মুহাদ্দিসীনগণ সূক্ষ্ম ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন এবং আমীরুল মু'মিনীনা ফিল হাদীস ইমাম বুখারী ৬ লক্ষ হাদীস মুখস্থ করার পর মোট ৪ হাজার সহীহ হাদীস বাছাই ক'রে তাঁর গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। অনুরূপ সহীহ-ধারায় ইমাম মুসলিম রচনা করেছেন সহীহ মুসলিম।

এইভাবে আয়েম্মায়ে হাদীস নিজ নিজ চেষ্টা-চরিত্রের সাথে যথাসম্ভব সহীহ-যয়ীফ-জাল নির্ধারিত করেছেন। তারপরেও কি আর কোন 'পরীক্ষার নূতন ধারা'র প্রয়োজন হয়?

নূরা আলম সাহেবের ধারায় বুখারীর মান হননকারীরা আবার বলেন, *'আমরা কিন্তু হাদীস শাস্ত্রের শিরোমণি (?) মহাম্মদ বিন ইসমাইল বুখারীর সমালোচনা করছি না।' (তত্ত্ব......২৪পৃঃ)* তাঁর গ্রন্থের সমালোচনা করছি। মানে তাঁর কান ধরছি না, তাঁকে জুতো মারছি আর কি? আর সেই সাথে বুখারীর অজ্ঞ, ভ্রান্ত ও নির্বুদ্ধি অন্ধভক্তদেরও মাথা নেড়া করছি মাত্র!

সত্যিপক্ষে এই সমালোচনায় অর্ধেক ইসলাম ধ্বংস হয়ে যাবে। মুসলিমদের মাঝে মুহাদ্দিসীন তথা আলেম-উলামাদের প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টি হবে। আর সেটা তো কম নয়।

মহানবী ﷺ বলেন, "তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের রোগ হিংসা ও বিদ্বেষ তোমাদের মাঝে অনুপ্রবেশ করেছে। আর বিদ্বেষ হল মুন্ডনকারী। আমি বলছি না যে, তা কেশ মুন্ডন করে; বরং দ্বীন মুন্ডন (ধ্বংস) ক'রে ফেলে। সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার জান আছে! তোমরা বেহেশ্তে ততক্ষণ প্রবেশ করতে পারবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত না ঈমান এনেছ। আর (পূর্ণ) ঈমানও ততক্ষণ পর্যন্ত আনতে পারবে না; যতক্ষণ না আপোসে সম্প্রীতি কায়েম করেছ। আমি কি তোমাদেরকে এমন কর্মের কথা বাতলে দেব না; যা তোমাদের ঐ সম্প্রীতিকে দৃঢ় করবে? তোমাদের আপোসে সালাম প্রচার কর।" *(তিরমিযী, বায্যার, বাইহাকীর শুআবুল ঈমান, সহীহ তিরমিযী ২০৩৮নং)*

আল-ইল্মু নূর

নূর আলম সাহেব লিখেছেন, *"আরবীতে একটি প্রবাদ আছে, 'আল-ইলমো ছিচরাতুল ফার্কিচ্ছুহা।' তার মানে নাকি 'ইসলামী বিদ্যা এক ধরনের ছেঁচড়া গোশ্তের মত, যার যেমন দাঁতের জোর, সে তেমনি টেনে খায়।" (তত্ত্ব.....২৪পৃঃ)*

আজ প্রায় ২২/২৩ বছর আরব দেশে বাস করছি, এই শ্রেণীর কোন আরবী কথা আমাদের জানা-শোনা নেই। হয়তো বা কোন জংলী বেদুঈন বাঙ্গালী-আরবদের ভাষা হবে। তাছাড়া ঐ 'ইয়ারকিমার্কা ফার্কিচ্ছুহা' প্রবাদের অর্থ যদি সত্য হয়, তাহলে যার দাঁত নেই অথবা বাঁধানো দাঁত, তার কি ঐ গোশ্ত মুখে নিয়ে রোমন্থন করা সাজে?

আসলে ওটি আরবী প্রবাদ নয়। ওর প্রথম শব্দটিই কেবল আরবী। কী জানি, বক্তা সে খবর রাখেন কি না? রাখলে অবশ্যই এটি শরয়ী ইল্মের প্রতি একটি নির্লজ্জ ব্যঙ্গ ও কটাক্ষ। আর তার পরিণাম অবশ্যই ভাল নয়।

পক্ষান্তরে শরয়ী জ্ঞান হল মানুষের জন্য নূর বা আলো। শরয়ী বিদ্যা নবুঅতের মীরাস। "নিশ্চয়ই আলেমগণ নবীগণের ওয়ারেসীন (উত্তরাধিকারী)। নবীগণ না কোন দীনারের উত্তরাধিকার করেছেন, না কোন দিরহামের। বরং তাঁরা ইল্মেরই উত্তরাধিকার করে গেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি তা গ্রহণ করে সে পর্যাপ্ত অংশ গ্রহণ করে থাকে।" *(আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাযাহ, ইবনে হিব্বান, বাইহাকী, সহীহ তারগীব ৬৭নং)*

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেছেন,

شكوت إلى وكيع سوء حفظي ... فأرشدني إلى ترك المعاصي
وأخبرني بأن العلم نورٌ ... ونور الله لا يُهدى لعاصي

'আমি আমার ওস্তাদ অকী'র নিকট আমার মুখস্থশক্তি দুর্বল হওয়ার অভিযোগ করলাম। তিনি আমাকে পাপাচরণ পরিহার করতে নির্দেশ দিলেন এবং বললেন, 'জেনে রেখো, ইল্ম নূর। আর আল্লাহর নূর কোন পাপাচারকে দেওয়া হয় না।' *(আল জওয়াবুল কাফী ৫৪ পৃঃ)*

দ্বীনকে বাঁচিয়ে রাখায় মাদ্রাসার ভূমিকা

মাদ্রাসা সমাজের দ্বীন-দরদী মুসলিমদের প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে চালানো হয় মুসলিমদের যাকাত-ফিতরা ও দান দিয়ে। যেগুলিকে চালানো দরকার ছিল মুসলিম রাষ্ট্রকে। সে ব্যবস্থা না থাকার ফলে মাদ্রাসারই মুদার্রিস-তালেবে ইল্মরা চাইতে যায়। তাতে তারা কত লাঞ্ছনার শিকার হয়, তার ইয়ত্তা নেই। চাঁদা নয়; (পার্টি বা গান-বাজনার জন্য) চাঁদা চাইতে কোন লজ্জা নেই, দিতেও কুণ্ঠা নেই। কিন্তু মুশকিল হল, মাদ্রাসার জন্য কিছু চাইতে যাওয়া, কারণ তা হল ভিক্ষা (?) করা।

এই শ্রেণীর মাদ্রাসা-শিক্ষিত নাদুস-নুদুস চেহারা দেখে কতক আধুনিক শিক্ষিত ব্যর্থ যুবকের গায়ে হিংসার জ্বালা ধরে। 'মূর্খ'দেরকে ইমামতি করতে, সমাজের নেতৃত্ব দিতে ও লেকচার দিতে দেখে ঈর্ষায় ফেটে পড়ে। ফলে শতমুখে তাঁদের সমালোচনা করে। তাঁরা তাদের দ্বারে এলে শতমুখী দিয়ে পারলে বিদায় করে!

অধিকাংশ আলেম মূর্খ হলেও নীতি-নৈতিকতায় ভাল। কেউ আদর্শচ্যুত হলে সে কথা ভিন্ন। আরবী ভাষা আয়ত্ত করতে না পারলেও দ্বীন, ইবাদত ও চরিত্র আয়ত্ত করে। কোন মাদ্রাসা দ্বারা বছরে অথবা বিশ বছরে যদি একটি আলেম হয়, তাই যথেষ্ট।

মনুষ্যমেধা নষ্ট হয়? বিজ্ঞানী হতে পারেন না? খোঁড়া আলেম হলেও তাঁর আমল-আখলাক ঠিক থাকে। যুক্তিবাদী না হতে পারলেও আল্লাহবাদী হন, আর তাই তাঁর ইহকাল পার ক'রে পরকালের জন্য যথেষ্ট। আসল লাভ-নোকসান তো পরকালের খাতায়।

প্রবীর ঘোষের হাওয়ালায় সমাজের আলেম-উলামাকে মূর্খ বলে ব্যঙ্গ ও তুচ্ছ করা কোন মুসলমানের কাজ নয়। *'মাদ্রাসা কেন্দ্রিক শিক্ষা মুসলিম সমাজকে প্রতারণা করছে' (তত্ত্ব...... ১১পৃঃ)*---এ কথাও কোন ন্যায়পরায়ণ মানুষের নয়।

মাদ্রাসা-শিক্ষা কেবল আরবী বলার জন্য নয়। স্কুলের সবাই কি ইংরেজী বলতে পারে? সবাই কি ভাল ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হতে পারে? সব বাঁশে কি বংশলোচন হয়?

মাদ্রাসা শিখায় ধর্ম ও নৈতিকতা, যেমন লেখক বলেছেন, 'ইসলাম ধর্ম টিকে আছে এ সকল আলেমদের অবদানের জন্যই।' *(তত্ত্ব...... ১১পৃঃ)* তাহলে প্রতারণা কী ক'রে হল?

অবশ্য প্রতারক ও ধর্ম-ব্যবসায়ী যে আছে---সে কথা অস্বীকার করছি না।

যাঁরাই কুরআন নিয়ে গবেষণা করেছেন, যাঁদের প্রতি *(তত্ত্ব......৭পৃষ্ঠায়) 'মাদ্রাসায় পড়ে মনুষ্যমেধা নষ্ট করেননি'* বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে, তাঁরা কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি কৃতজ্ঞ। যেহেতু তাঁরা গবেষণার যে রসদ পেয়েছেন, তা মাদ্রাসা শিক্ষারই ফসল।

প্রতিভাধর ডঃ যাকির নায়েক সাহেব বহু কিছু জানেন, কিন্তু অনেক কিছু জানেন না। তাঁর দ্বারা কি দ্বীনের সবকিছুর সমাধান পাওয়া যাবে? কোন ফতোয়া জিজ্ঞাসা করলে কেন তিনি বলেন, 'উলামা সে পুছো। ম্যাঁয় তালেবে ইল্ম হুঁ'?

পক্ষান্তরে আরবী ভাষা? 'আরবী পারবি তো পারবি, না হয় হেগে-মুতে ছাড়বি।' 'ছিঁচরাতুল ফার্কিচ্ছুহা'র মত নয়। আরবী বলতে পারা বড় কঠিন। সরকারী মাদ্রাসার কথা বলছি না, বেসরকারী মাদ্রাসায় যেভাবে আরবী পড়ানো হয়, তাতেও একটি আরবী শুদ্ধ বাক্য বলতে হিমসিম খেতে হয়---সে কথা আমরা জানি।

আমি বাংলা পড়েছি, ইংরেজী পড়েছি, হিন্দী পড়েছি, উর্দু পড়েছি, ফারসী পড়েছি, আরবী পড়েছি। কিন্তু এর মধ্যে সবচেয়ে কঠিন পেয়েছি আরবীকে। আরবীতে কথা বলা সহজ নয়। যে

সকল প্রবাসী এখানে কাজের জন্য আসে, তারাও আরবী বলে। কিন্তু সে আরবীর নাম 'আরাবিয়াতু বাতহা।' অর্থাৎ, রাজধানী রিয়াযস্থ বাতহা মার্কেটের আরবী। যে মার্কেটে প্রায় সবাই বাইরের লোক। আর তারা যে আরবী বলে, তা বড় সহজ।

উদাহরণ স্বরূপ ঃ বাংলায় ১জন ছেলে ও মেয়ে (এসেছে), ২জন (এসেছে), ৩জন (এসেছে)। বাতহার আরবীও অনুরূপ বাংলার মতই ঃ ১জন ছেলে ও মেয়ে (ইজি), ২জন (ইজি), ৩জন (ইজি)। অথচ বর্তমান-ভবিষ্যতের জন্যও ঐ (ইজি) বলা হয়। সুতরাং তাদের জন্য ঐ আরবী ইজি। কিন্তু শুদ্ধ আরবী হল ঃ ১জন ছেলে (জা-আ), ২জন (জা-আ-), ৩জন (জা-উ)। ১জন মেয়ে (জা-আত), ২জন (জা-আতা), ৩জন (জি'না)। আর এইভাবে প্রত্যেক ক্রিয়া নারী-পুরুষ, কাল ও বচনের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ হবে। অতএব এ ভাষা আয়ত্ত করা সহজ নয়।

হ্যাঁ, অবশ্যই আমাদের ক্রটি আছে---সে কথা স্বীকার করতে দোষ নেই। যেমন ঃ

আমরা আমাদের (বিশেষ ক'রে বাংলার) মাদ্রাসাগুলোতে আরবী পরিবেশ সৃষ্টি করা হয় না। আমরা হিন্দুস্তানের মানুষ হিন্দী-উর্দু মাদ্রাসার সাথে যোগাযোগ রাখার জন্য উর্দু মিডিয়াম ক'রে পড়ে থাকি। আগে ছিল এখনও হয়তো কোথাও কোথাও থেকে থাকবে, আরবী গ্রামার ফারসী ভাষায়, তার অনুবাদ উর্দুতে। ফলে নিজের ভাষায় ছাত্ররা আরবী বুঝতে পারে না। আর তার ফলে অনেক মার খেতে হয়।

পক্ষান্তরে ইংরেজী মিডিয়ামের মত যদি আরবী মিডিয়াম মাদ্রাসা করা যেত, তাহলে আরবী শুদ্ধ বাক্য বলা সহজ করা যেত। পক্ষান্তরে সরকারী মাদ্রাসাগুলোতে যে অন্যান্য সকল বিষয় আছে, তার চাপে আরবী আয়ত্ত করা কার সাধ্য?

এ কথাও অনস্বীকার্য যে, প্রাতিষ্ঠানিক কোন স্কুল-মাদ্রাসায় না পড়ে অথবা তত উচ্চ ক্লাশে না পড়ে অনেকে কবি-লেখক-বৈজ্ঞানিক হয়েছেন। কিন্তু তা হল প্রতিভা। ডঃ যাকির নায়েক সাহেবও একজন প্রতিভাধর।

তাছাড়া স্কুল-মাদ্রাসা 'রত্ন' তৈরী করে না, 'রত্ন'রূপে তৈরী হওয়ার পথ দেখায় মাত্র। অতিরিক্ত নিজস্ব প্রচেষ্টা ও স্টাডি না থাকলে কেউ 'রত্ন' হতে পারে না।

আবার প্রত্যেক শিক্ষার একটা লক্ষ্য থাকে। সেই লক্ষ্য অনুযায়ী ছাত্র প্রস্তুতি গ্রহণ করে। এখন চাকরি যদি কেবল সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে হয়, তাহলে তাই ধান্দা হবে ছাত্রের। আর চাকরি যদি আরবী বলার উপরে হয়, তাহলে আরবী বলতে পারবে ছাত্র। একে তো তাদের চাকরি নেই, তাতে আরবী বলার শর্ত নেই। তাহলে কেন বৃথা মেহনত করবে ছাত্রেরা? ধর্মকর্ম তো আরবী বলতে না পারলেও হবে; পড়ে মানে বুঝতে পারলেই তো যথেষ্ট।

আর এ কথাও ঠিক যে, অনেক আলেম জাহেল হয়েই থেকে যায়; তারা না আরবী শিখতে পারে, আর না বাংলা। অবশ্য দ্বীনদারী শেখে, আখলাক-চরিত্র শেখে। আর সেটাও তো বড় লাভ। পক্ষান্তরে স্কুলে পড়ে যারা আনপড় থেকে যায়, তাদের এ কূল-ও কূল দু'কূলই যায়।

নিজ মাতৃভাষায় শরয়ী ইল্‌ম বিতরণ না করতে পারাও একটা ক্রটি আলেমদের। আর তার জন্য তাঁরা নিজেরা নন; বরং শিক্ষা-ব্যবস্থাই এর জন্য দায়ী। বাংলার বেসরকারী মাদ্রাসাগুলোতে যদিও বাংলা ইদানীং ঢুকেছে, তবুও তাতে রচনা ও প্রবন্ধ লেখাবার সুষ্ঠু সুব্যবস্থা নেই অথবা সেই শ্রেণীর শিক্ষক নেই।

তবে এ কথাও বলছি না যে, আরবী বলার মত কোন আলেমই নেই। যাঁরা ইন্টারভিউ দিতে গিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে হয়তো কেউ পারেননি। তাবলে হাঁড়ির ভাত দেখার মত, তাঁদের উপর কিয়াস ক'রে *'সারা বাংলার কোন আলেম একটি শুদ্ধ আরবী বাক্য বলতে পারেন না এবং সেহেতু মাদ্রাসা-শিক্ষা মুসলিম সমাজকে ধোঁকা দিচ্ছে' (তত্ত্ব...... ১১পৃঃ)*---এত বড় কথা বলার

আস্পর্ধা রাখি না।

মোটকথা, যাঁরা মাদ্রাসায় পড়ে মনুষ্যমেধা নষ্ট করেননি, তাঁরা যে কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা ক'রে মনুষ্যমেধার লালন করেছেন, তাতে কিন্তু কুরআনী তথ্য পাননি। বরং কুরআনের অর্থ বুঝার জন্য ঐ মেধা নষ্টকারী কোন-না-কোন মাদ্রাসা-শিক্ষিত লোকের সাহায্য প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে নিতে হয়েছে। এ কথা কোন অবিমৃশ্যকারী অস্বীকার করলেও, তাঁরা নিজেরা সে কথা স্বীকার করেন।

তাছাড়া সে সকল বিদ্যামন্দিরে পড়াশোনা ক'রে যদি কুরআনভিত্তিক যুক্তির সাথে শরয়ী জ্ঞান লাভ হতো, তাহলে আজ মুসলমানদেরকে ভিখেরী বিদ্যালয় খুলে বসে দয়ে পড়া হাতির মত চামচিকের কাছেও এত লাথি খেতে হতো না।

মনুষ্যমেধা নষ্টকারী কোন মাদ্রাসায় না পড়ে অন্য জেনারেল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পড়ে শরীয়তের মুফতী হয়েছেন---আছে কি এমন উদাহরণ?

নূর আলম বলেন, '*ইসলাম নিয়ে নতুন ক'রে ভাবতে হবে।*' *(তত্ত্ব..... ১৪পৃঃ)* কাদেরকে নিয়ে ভাববেন? যারা অনুবাদ নকল ক'রে তাহকীক করে এবং অনুবাদটা ঠিক কি না তাও জানে না, তাদেরকে নিয়ে? নাকি ধর্মনিরপেক্ষ বা সব-ধর্ম-সমান জ্ঞানকারী তথাকথিত চিন্তাবিদ্‌দেরকে নিয়ে?

কুরআন কেন অবতীর্ণ হয়েছে?

কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে মানুষের ঈমান, জান, মান, জ্ঞান ও ধনকে রক্ষা করার জন্য। মানুষের মান ও হুঁশ বজায় রাখার জন্য। মানবকে মান্যবর করার জন্য। কুরআন যেমন মৃতব্যক্তির জন্য, জীবিত ব্যক্তির তাবীয বানাবার জন্য অবতীর্ণ হয়নি, তেমনি কমপিউটার বা রকেট বানাবার জন্যও অবতীর্ণ হয়নি।

কুরআনের সাথে বিজ্ঞানের সামঞ্জস্য সাধন ক'রে কোন অনুবাদ বা ব্যাখ্যা করা ভুল। কারণ বিজ্ঞান আজ যে তথ্য বলে, কাল তা ভুল প্রমাণ করে। আর তাতে কুরআনও ভুল প্রমাণিত হবে। মাদ্রাসায় পড়া আলেমরা কুরআনের বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্ত্ব না দিতে পারেন, তাঁরা তো সেই তথ্য ও তত্ত্ব পরিবেশন করেন, যার জন্য কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ}

অর্থাৎ, তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ ও কিতাব এবং প্রজ্ঞা (সুন্নাহ) যা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন ও যা দিয়ে তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন, তা স্মরণ কর। *(সূরা বাক্বারাহ ২৩১ আয়াত)*

{شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ}

অর্থাৎ, রমযান মাস, এতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। *(ঐ ১৮৫ আয়াত)*

{إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا} (٩) سورة الإسراء

অর্থাৎ, নিশ্চয় এ কুরআন এমন পথনির্দেশ করে, যা সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সৎকর্মপরায়ণ বিশ্বাসীদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার। *(সূরা বানী ইস্রাঈল ৯ আয়াত)*

{وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلاَّ نُفُورًا} (٤١) سورة الإسراء

অর্থাৎ, এই কুরআনে বহু কথাই আমি বারবার (বিভিন্নভাবে) বিবৃত করেছি, যাতে তারা

উপদেশ গ্রহণ করে; কিন্তু তাতে তাদের বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়। *(ঐ ৪১ আয়াত)*

{وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا}

অর্থাৎ, আমি অবতীর্ণ করি কুরআন, যা বিশ্বাসীদের জন্য আরোগ্য ও করুণা, কিন্তু তা সীমালংঘনকারীদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে। *(ঐ ৮২ আয়াত)*

{وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ} (٢٧) سورة الزمر

অর্থাৎ, আমি এ কুরআনে মানুষের জন্য সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি; যাতে ওরা উপদেশ গ্রহণ করে। *(সূরা যুমার ২৭ আয়াত)*

{وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ } (١٧) سورة القمر

অর্থাৎ, নিশ্চয় আমি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ ক'রে দিয়েছি। অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি? *(সূরা ক্বামার ১৭ আয়াত)*

তবে এ কথা অস্বীকার করার নয় যে, কুরআনে বৈজ্ঞানিক তথ্য আছে। কিন্তু বিজ্ঞান যা প্রমাণ করছে, তার বিপরীত যদি কুরআনে থাকে, তাহলে জানতে হবে যে, হয় বিজ্ঞানের তথ্য ভুল, না হয় আমাদের কুরআন বুঝা ভুল। অনুরূপ হাদীসও।

যতই জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন হোক, মায়ের পেটে কী আছে তা কেউ বলতে পারবে না। অর্থাৎ, গায়বী খবর আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। আর গায়বী খবর সেই খবরকে বলা হয়, যা বিনা কোন মাধ্যম বা অসীলায় বলা হয়। আল্লাহর নবী ﷺ গায়েব জানতেন না। কিন্তু গায়বের খবর বলতেন। আল্লাহর নিকট থেকে অহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়ে অনেক গায়বী খবর বলেছেন। আর যা কোন অসীলা, মাধ্যম বা যন্ত্রের সাহায্যে বলা হয়, তা গায়বী খবর নয়। বর্তমানে কোন যন্ত্রের সাহায্যে ছেলে, মেয়ে, না টিউমার জানতে পারলেও অথবা বীর্যবিন্দুর লিঙ্গ নির্ণয় করতে সক্ষম হলেও কুরআনের ঐ আয়াতের অর্থের কোন পরিবর্তনের দরকার নেই।

মহান আল্লাহর চ্যালেঞ্জ, আসমান-যমীনে কেউ গায়বী (অদৃশ্য) খবর জানে না। *(সূরা নাম্‌ল ৬৫ আয়াত)* কিন্তু কোন কিছুর মাধ্যমে জানলে, তা আর গায়বী থাকে না; বরং হাযরী (দৃশ্য) খবর হয়ে যায়। আর তা জানতে কোন বাধা নেই।

আল-কুরআন বিজ্ঞানময় গ্রন্থ, তা নিয়ে রিসার্চ করবেন বৈজ্ঞানিকগণ। কিন্তু কুরআন যে উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়েছে, তা নিয়ে গবেষণা করবেন উলামা ও ফুকাহাগণ। এই ধরুন নামায; নামায নিয়ে গবেষণা ক'রে উলামাগণ বলেন, 'তা হল আল্লাহ ও বান্দার সংলাপ-সেতু। সবচেয়ে বড় ইবাদত নামায।'

জিমন্যাস্টগণ বলবেন, 'নামায একটি সুন্দর ব্যায়াম। এতে ভাল শরীরচর্চা হয়।'

তা হতে পারে, তা বলতে পারেন, কিন্তু নামায এ জন্য নয়। আর শরীরচর্চার উদ্দেশ্যে কেউ নামায পড়লে, তার নামাযই শুদ্ধ নয়।

মনোবিজ্ঞানীগণ অন্য কিছু বলতে পারেন। নামাযে মানসিক উপকারিতার কথা আবিষ্কার করতে পারেন; তা বলে সে উদ্দেশ্য নামাযের নয়।

সমাজবিজ্ঞানীগণ আরো কিছু উপকারিতার কথা বলতে পারেন, আর তাতে তা থাকতে পারে। কিন্তু নামাযের উদ্দেশ্য তা নয়।

তাহলে তা নিয়ে শরয়ী উলামাগণকে তাচ্ছিল্য এবং বৈজ্ঞানিক গবেষকগণকে নিয়ে এত গর্ব কেন? আসল ছেড়ে কি নকল নিয়ে টানাটানি? আধ্যাত্মিকতা ছেড়ে কি বাহ্যিকতা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত? কিন্তু ইসলাম তো সে আনুষ্ঠানিকতা ও আড়ম্বরের ধর্ম নয়। ইসলাম ও কুরআন-

সুন্নাহ বিজ্ঞানময়, তা প্রমাণ করতে রিসার্চের দরকার হয় না। কেবল নিজের যা আছে তা নিয়ে আত্মমর্যাদাবোধের দরকার আছে। আমাদেরই যে আছে, সে কথা অন্তরের অন্তস্তলে অনুভূতির প্রয়োজন আছে। মনের ভিতরে যদি বল রেখে বলা হয়, ইসলাম যুক্তির বাইরে নয়, তাহলে নিশ্চয়ই যুক্তি দিয়ে সেই কথার যৌক্তিকতা প্রমাণ করা সহজ, যাকে অমুসলিম ও দুর্বল ঈমানের লোকেরা অযৌক্তিক মনে করে।

তারা যুক্তিবাদী নয়, যারা পরের কথা শুনে ঘরের লোককে সন্দেহ করে। বউয়ের কথা শুনে মা-কে মারধর করে!

মু'জিযা বা অলৌকিক ঘটনা

মহানবী ﷺ মহামানব ছিলেন। তিনি স্বাভাবিক আড়ম্বরহীন জীবন-যাপন করতেন। কাফেররা তাঁকে নবী বলে অস্বীকার করলে অথবা কুরআনকে আল্লাহর কালাম বলে অস্বীকার করলে তিনি মনে মনে মু'জিযা কামনা করতেন। কিন্তু মহান আল্লাহর হিকমত ছিল অন্য কিছুতে, তাই তিনি কোন নবীকে তাঁর চাওয়া অনুপাতে মু'জিযা দান করেননি। তবে যে তিনি তাঁদেরকে মোটেই মু'জিযা দান করেননি---তা নয়। তাঁর যখন ইচ্ছা হয়েছে, তখন তিনি মু'জিযা প্রয়োজনে দান করেছেন। সুতরাং মু'জিযা নবী বা তাঁর বিরোধীর চাওয়া অনুপাতে দেওয়া হয় না; বরং আল্লাহর ইচ্ছা ও হিকমত অনুপাতে নবী মু'জিযা লাভ করেন। আর এটাই হল মু'জিযা ও যাদুর মধ্যে পার্থক্য। যাদু ইচ্ছামত যাদুকর প্রদর্শন করতে পারে। কিন্তু নবী নিজ ইচ্ছামত মু'জিযা প্রদর্শন করতে পারেন না। কুরআনে এ কথা বলা হয়নি যে, মহানবী ﷺ-কে মু'জিযা দেওয়াই হয়নি। তবে কুরআন হতে এ কথা বুঝা যায় যে, তাঁর চাহিদা মোতাবেক তাঁকে তা দেওয়া হয়নি। যেহেতু কুরআনেই আছে, তাঁকে কুরআন ছাড়া অন্যান্য কিছু মু'জিযা দেওয়া হয়েছে।

যেমন কুরআনে আছে চাঁদ দু-টুকরা হওয়ার কথা; যদিও নানা অপব্যাখ্যায় বাস্তববাদীরা তা অস্বীকার করেছেন।

কুরআনে আছে 'ইসরা' (রাত্রি মধ্যে মক্কা থেকে জেরুজালেম) সফরের কথা। মহান আল্লাহ বলেন,

{سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ} (١) سورة الإسراء

অর্থাৎ, পবিত্র ও মহিমময় তিনি যিনি তাঁর বান্দাকে রাতারাতি ভ্রমণ করিয়েছেন (মক্কার) মাসজিদুল হারাম হতে (ফিলিস্তীনের) মাসজিদুল আক্বসায়, যার পরিবেশকে আমি করেছি বর্কতময়, যাতে আমি তাকে আমার কিছু নিদর্শন দেখাই; নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। *(সূরা ইসরা ১ আয়াত)*

কুরআনে আছে মি'রাজের ইঙ্গিত; যদিও 'মি'রাজ' শব্দ কুরআনে নেই। মহান আল্লাহ বলেন,

[مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى (١١) أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى (١٢) وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى (١٣) عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى (١٤) عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى (١٥) إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى (١٦) مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى (١٧) لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى] (١٨)

অর্থাৎ, যা সে দেখেছে, তার হৃদয় তা অস্বীকার করেনি। সে যা দেখেছে, তোমরা কি সে বিষয়ে

তার সঙ্গে বিতর্ক করবে? নিশ্চয়ই সে তাকে আরেকবার দেখেছিল। সিদরাতুল মুনতাহার নিকট। যার নিকট অবস্থিত (জান্নাতুল মা'ওয়া) বাসোদ্যান। যখন (বদরী) বৃক্ষটিকে, যা আচ্ছাদিত করার ছিল তা আচ্ছাদিত করল, তার দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি, দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয়নি। নিঃসন্দেহে সে তার প্রতিপালকের মহান নিদর্শনাবলী দেখেছিল। *(সূরা নাজ্‌ম ১১- ১৮ আয়াত)*

যে বাস্তববাদীরা কুরআন ছাড়া কোন মু'জিযাই মহানবী ﷺ-কে দেওয়া হয়নি বলে দাবী করেন, তাঁদের কেউ কেউ আবার এ কথাও বলেছেন, (যেমন নূর আলম সাহেব বলেছেন) *'রসূল সঃ এর মেহেরাজ হয়েছিল এর উপর বিশ্বাস করাটাই হল মোমিনত্বের পরিচয়! কেননা মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয়তম রসূলকে যে কোন ভাবেই তাঁর কুদরতি বিষয়গুলি দেখাতে, শোনাতে এবং বোঝাতে সক্ষম।' (তত্ত্ব...... ৪৬পৃঃ)*

চমৎকার! এটাই তো ঈমানদার যুক্তিবাদীর কথা। আর তাঁর 'মেহেরাজ' সশরীরে না হয়ে স্বপ্নে হলে, কাফেররা অবিশ্বাস করবে কেন? স্বপ্নকে অবিশ্বাস করার মত যুক্তি তো সে যুগে ছিল না। এইভাবে সহীহ হাদীসে বর্ণিত অন্যান্য মু'জিযাকেও বিশ্বাস ক'রে নেওয়াই 'মোমিনত্বের পরিচয়'।

কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, বুখারী-মুসলিম তথা আরো অন্যান্য গ্রন্থের সহীহ হাদীসে রয়েছে আরো বহু মু'জিযার কথা; যা বাস্তববাদীরা চোখ বন্ধ ক'রে ফুঁক দিয়ে ধুলো উড়াবার মত উড়িয়ে দেন এবং অন্ধের ক্ষুর চালাবার মত সে সকল হাদীসকে একবাক্যে 'কল্পিত ও জাল' আখ্যায়িত ক'রে চুল চাঁছার সাথে কানও চেঁছে ফেলেন!

অবশ্য মু'জিযা অস্বীকার করার মূলে কেবল আমাদের বাংলার নবোদ্ভূত যুক্তিবাদীরাই নন, তাঁদের বহু পূর্বে মু'তাযিলা প্রভৃতি গুমরাহ ফির্কা মু'জিযা অস্বীকার ক'রে গেছে এবং তাদেরই তফসীর (যেমন ঃ তফসীর রাযী প্রভৃতি) ও অন্যান্য বই-পুস্তক পড়ে মওলানা আকরাম খাঁ ও তাঁর অনুসারিগণ ইচ্ছামত মু'জিযা অস্বীকার ক'রে চলেছেন।

যেমন ফিরিশ্‌তা, জিন-জগৎ সত্য। গায়বী জগৎকে আমরা বিশ্বাস করি। তেমনি কুরআনে মু'জিযার কথা আছে, তাও আমরা বিশ্বাস করি। কুরআনে কি এ কথা আছে যে, হে মুহাম্মাদ! তোমাকে কুরআন ছাড়া অন্য কোন মু'জিযা দিইনি?

অবশ্য এ কথাও অনস্বীকার্য যে, মু'জিযার নামে অনেক জাল হাদীস বিভিন্ন ইসলামী কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। আর তার মানেই এ নয় যে, মু'জিযা সংক্রান্ত যত হাদীস আছে, সবই জাল। নিশ্চয়ই মু'জিযা ও কারামতের নামে অপ্রমাণিত গাল-গল্প স্বীকৃত নয়।

মহানবী ﷺ-এর জীবনী, মোস্তফা চরিত ও মু'জিযা

নূর আলমী প্রকৃতির যুক্তিবাদীরা সেই সন্দিগ্ধ (?) বুখারী-মুসলিমের হাদীস পেশ ক'রেই বলেন, 'মা আয়েশা বলিয়াছেন, মহানবী ﷺ-এর জীবনাদর্শ ছিল কুরআন। তাঁর জীবনাদর্শ কোরাণের বাইরে কিছু নেই!'

'এই হাদীস মুতাবিক রসূল সঃ এর জীবনাদর্শ কেমন ছিল তা সঠিকভাবে পেতে হলে মূলত কোরাণকেই অনুসরণ করা উচিত ছিল। কিন্তু বাস্তবে তা হয়ে উঠেনি। বরং গুটিকয় (!) লেখকের সংগৃহীত তথ্যের উপর চরম নির্ভরশীল হওয়ায় কোরাণের বিপরীত বর্ণনাগুলি চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়নি। বর্তমানে কোরান ও হাদীস ব্যাপকভাবে অনুবাদ হওয়ার ফলে (নাকি

মোস্তফা চরিত পড়ে?) আমরা বুঝতে পারছি যে, হাদীস গ্রন্থে অনেক বর্ণনা আছে যা মূলত কোরাণের পরিপন্থী।' (তত্ত্ব.....২৫পৃঃ)

সুহৃদ পাঠক! আপনি অবশ্যই বুঝতে পারছেন যে, জীবনী ও জীবনাদর্শ এক নয়। হাদীসে বলা হয়েছে, মহানবী ﷺ-এর 'খুলুক' আখলাক বা চরিত্র ছিল কুরআন। হাদীসে 'হায়াত' বা জীবনী কেমন ছিল, তার বর্ণনা দেওয়া হয়নি। যদি 'তাঁর জীবনাদর্শ কোরাণের বাইরে কিছু নেই', তাহলে আবার 'মোস্তফা চরিত' কেন রচিত ও পঠিত হল? কেবল কুরআন পড়লেই তো তাঁর জীবনাদর্শ ও জীবনের খুঁটিনাটি সব পাওয়া যেত।

অনুবাদ হওয়ার আগে বাংলার মানুষ না হয় ধরেই নিলাম 'বুদ্ধু' ছিল। কিন্তু যাঁদের অনুবাদের দরকার নেই, তাঁরা ও তাঁদের আলেম-উলামারাও কি অনুরূপ ছিলেন? নাকি যুক্তিবাদী আধুনিক জ্ঞানচর্চা শুধু সোনার বাংলাতেই শুরু হল।

যাঁরা অনুবাদ সঠিক না ভুল---তাই বুঝেন না, তাঁরা আবার কোরাণের পরিপন্থী হাদীস কিভাবে বুঝতে পারছেন?

মহানবী ﷺ-এর জীবনাদর্শ নয়; বরং জীবনী থেকে 'মু'জিযা'কে মাথার চুল নেড়া করার মত নেড়া ক'রে মুছে দিতে চাওয়া হয়েছে। শুধু ঘটনা অস্বাভাবিক বলে সহীহ হাদীসকেও এবং 'যার শিল তারই নোড়া, তারই ভাঙ্গ দাঁতের গোড়া'র মতো বুখারী-মুসলিমের হাদীস দিয়ে বুখারী-মুসলিমের হাদীসকে অস্বীকার করা হয়েছে! এটাই কি আসলে 'লায়ে চেপে লা ঠেলার মত' নয়? অথচ যুক্তিবাদীদের অনেকে আবার কুরআন-ভিত্তিক মু'জিযাকে মানেন এবং তখন 'আল্লাহর কুদরতি' স্বীকার ক'রে যুক্তিকে মুক্তি দেন।

পক্ষান্তরে হাদীসে বর্ণিত হলে, সে মু'জিযা মানেন না এবং তখন 'আল্লাহর কুদরতি' নজরে আসে না। এটা বড়ই আশ্চর্যের কথা। অবশ্য এই শ্রেণীর যুবকদের ওস্তাদগণ কুরআনে বর্ণিত আম্বিয়াগণের মু'জিযাকেও অস্বীকার করেন।

সহীহ বুখারীর অনুবাদক মাওলানা আজিজুল হক সাহেব বলেন, 'বহু সমালোচিত পণ্ডিত আক্রম খাঁ মরহুম...... শ্রেণীর লোকদের একটি বাতিক রোগ আছে যে, কোরআন-হাদীছে বর্ণিত কোন অলৌকিক ঘটনাকে তাঁহারা অলৌকিক ও অসাধারণ রূপে গ্রহণ করিতে চান না, এই নীতি অনুসারেই পণ্ডিত সাহেব পবিত্র কোরআনে নবীগণের "মোজেযা" স্বরূপ যত ঘটনার উল্লেখ আছে সবগুলিকেই বিকৃত রূপ দান করিয়া পবিত্র কোরআনের অপব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই ঘটনায় ত দেখা যায়, পণ্ডিত সাহেব আল্লাহর কুদরত সম্পর্কেও তদ্রূপ ঈমানই পোষণ করেন---সেখানেও তিনি কোন অলৌকিক অসাধারণ বিষয়কে স্থান দিতে রাজি নহেন। নাঊযু বিল্লাহি মিন যালিকা---এইরূপ ধারণা হইতে আমরা আল্লাহ তাআলার আশ্রয় চাই।' *(বাংলা বোখারী শরীফ ৪/১০৩)*

'মোস্তফা চরিত সঙ্কলকের স্বভাবগত কুঅভ্যাসই ইহা যে, যাহা তাহার মনঃপূত না হইবে তাহাকে "গল্প" বলিয়া আখ্যা দিবে, যদিও তাহা জগতভরা ইতিহাসের পাতায়, এমনকি হাদীছ গ্রন্থেও বিদ্যমান থাকে।' *(ঐ ৫/৬২)*

'মোস্তফা চরিত গ্রন্থের সঙ্কলক মরহুম আকরম খাঁ সাহেবের দুর্ভাগ্য---যখনই নবীগণ সম্পর্কে কোন অসাধারণ অস্বাভাবিক (অসম্ভব নয়) ঘটনার উল্লেখ আসিয়াছে, তখনই তাঁহার পেটে ব্যথা সৃষ্টি হইয়াছে এবং উদরাময়গ্রস্তের ন্যায় বেসামালরূপে নানা পচা-গলা, মল-ময়লার উদ্‌গিরণ আরম্ভ করিয়াছেন।' *(ঐ ৫/৬৯)*

এই জন্যই 'মোস্তফা চরিত' বইটির জন্য বলা হয়েছে 'পবিত্র নামের অপবিত্র বই'। *(ঐ ৬/১০১)*

আমরা এখানে একটি কথা বলে রাখি যে, আমরাও যুক্তিকে অগ্রাহ্য করি না। তবে অহীর উপর আমরা যুক্তিপ্রদর্শনের দুঃসাহসিকতা করি না। অহীর বাণী আমাদের জ্ঞানে না ধরলে আমাদের জ্ঞানকে ছোট মনে করি।

দলীল না থাকলে যুক্তির আশ্রয় অবশ্যই নিতে হয়। উদাহরণ স্বরূপ মহানবী ﷺ-এর ইসরা ও মি'রাজ ভ্রমণকে আমরা বিশ্বাস করি। কিন্তু ২৭ বছর অতিবাহিত হওয়ার কথা বিশ্বাস করি না। এ কথা অবিশ্বাস করার ফলে এক ইয়াহুদীর পানিতে গোসল করার জন্য ডুবে নারী হয়ে তার তিন সন্তান হওয়ার পর পুনরায় ডুবে সেই পূর্বেকার পুরুষ হয়ে যাওয়ার কথা আমরা অবিশ্বাস করি। কারণ, এর কোন সহীহ দলীল নেই এবং তা যুক্তিরও অগ্রাহ্য। উজ বিন উনুকের সমুদ্রে মাছ ধরে সূর্যের তাপে ভুনে খাওয়ার কথাও আমরা বিশ্বাস করি না। ইত্যাদি।

কুরআন একটি চিরন্তন মু'জিযা। এ মু'জিযার মর্তবা বয়ান করা দোষের কি? মহানবী ﷺ আমাদের জন্য মহাদান, তা বলে কি তাঁর মর্তবা বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই? নামায ফরয বলে কি তার ফযীলত বর্ণনা করা দোষের হবে? সমস্ত মঙ্গলামঙ্গলের মালিক আল্লাহ। তা বলে কি চিকিৎসা অবৈধ? যে চিকিৎসার অনুমতি রয়েছে শরীয়তে, সে চিকিৎসা করা অবৈধ নয়। কুরআনী আয়াত দ্বারা ঝাড়ফুঁক ক'রে চিকিৎসা অবৈধ নয়। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا}

অর্থাৎ, আমি অবতীর্ণ করি কুরআন, যা বিশ্বাসীদের জন্য আরোগ্য ও করুণা, কিন্তু তা সীমালংঘনকারীদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে। *(সূরা বানী ইস্রাঈল ৮২ আয়াত)*

কুরআন মানুষের হার্দিক, দৈহিক ও বিশেষ ক'রে মানসিক রোগের আরোগ্য। বিজ্ঞানও স্বীকার করেছে ঝাড়ফুঁক দ্বারা বিশেষ ক'রে মানসিক রোগের চিকিৎসায় উপকারিতার কথা।

যদি বলেন, অনেক সময় কাজ হয় না তো। আমরা বলব, সব সময় কাজ তো ওষুধ দ্বারাও হয় না। আর ঝাড়ফুঁক তো দুআর মত। দুআ যেমন সব সময় কবুল হয় না, অনুরূপ কোন কারণে ঝাড়ফুঁকও সব সময় কাজ না করতে পারে। তা বলে তা অস্বীকার তো করা যায় না। সহীহ হাদীসে যখন সে চিকিৎসার কথা এসেছে, সূরা নাস-ফালাক যখন ঝাড়ফুঁকের পটভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে, তখন বস্তুবাদীদের এ অস্বীকার কেন? সিংহভাগ আলেমই কুরআন দিয়ে জীবিকা অর্জন করছেন বলে হিংসা হচ্ছে না তো?

অবশ্যই কুরআন দিয়ে জীবিকা অর্জন বৈধ নয়, কুরআনী আয়াত দিয়ে তাবীয, লকেট, বোর্ড বানিয়ে লটকানো ও টাঙ্গানো বৈধ নয়, কুরআন কেবল ফুঁ দেওয়ার গ্রন্থরূপে অবতীর্ণ হয়নি---এ কথা ঠিকই, কিন্তু যা শরয়ীভাবে বৈধ, তা অবৈধ ঘোষণা করা বস্তুবাদী ও যুক্তিবাদীদের কাজ, নাকি আলেম-মুফতীদের কাজ? ইসলাম যুক্তির ধর্ম মানে এই নয় যে, যে যুক্তি দিয়ে নামায-রোযা উড়িয়ে দেবে, তার যুক্তিও মান্য হবে। তাছাড়া উলামা-মুহাদ্দিসীনদের যুক্তিও তো যুক্তি। কুরআনের উক্তির উপর যেমন জোর দেওয়া যায়, তেমনি সহীহ হাদীসের উক্তির উপরে জোর দেওয়াও তো অযুক্তিকর নয়। আর কেবল দাবী ক'রে কোন হাদীসকে 'জাল' বা ভিত্তিহীন' বলে উড়িয়ে দেওয়াও যুক্তির কথা নয়।

আপনাকে আপনার বাড়ি থেকে বের ক'রে দিয়ে সে বাড়িতে বসে যদি কেউ বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে দাবী করে যে, সে বাড়িটা তার, তাহলে যুক্তি দিয়ে কি আপনার বাড়িটা দখল করা যাবে? আপনার কাছে দলীল-পর্চা থাকলে ঐ জবরদখলকারীর সমস্ত যুক্তি কি শুকতি হয়ে বাতাসে উড়ে যাবে না?

চন্দ্র দ্বিখন্ডন

মুহাদ্দিস কাযী ইয়ায (রঃ) তাঁর শিফা নামক গ্রন্থে বলেন, 'চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হওয়ার ব্যাপারটি কুরআনের স্পষ্ট উক্তি দ্বারা প্রমাণিত। কুরআন তা ঘটেছে বলে সংবাদ দিয়েছে। দলীল ছাড়া এর বাহ্যিক অর্থ বর্জন করা যাবে না। আর (নবুঅতকালে) ঘটনার সন্দেহ নিরসন ক'রে বহুধাসূত্রে বহু সহীহ হাদীস এসেছে। সুতরাং দ্বীনের বন্ধন শিথিলকারী কোন অপদার্থ মতভেদ আমাদের সুদৃঢ় প্রত্যয়কে দুর্বল করতে পারবে না। সেই বিদআতীর প্রলাপোক্তির প্রতি ভ্রূক্ষেপ করা যাবে না, যে দুর্বল মু'মিনদের হৃদয়ে সন্দেহ প্রক্ষেপ করে। বরং আমরা তাকে এই প্রত্যয়ে প্রত্যয়ী হতে বাধ্য করব এবং তার প্রলাপকে ফাঁকা মাঠে ছুঁড়ে ফেলব।' *(আশ্-শিফা ১/১৮৩, নাযমুল মুতানাসির ২১১পৃঃ)*

দাজ্জাল

কিয়ামত আসবে, তার পূর্বে দাজ্জাল বলে একটি লোক আসবে এবং ইয়াহুদীদের নেতা হবে---এ কথা বিশ্বাস করলে কি ইসলাম যুক্তিহীন হয়ে যাবে?

নূর আলম বলেন, *'এর সকল বর্ণনাই অসঙ্গতিপূর্ণ ও ভিত্তিহীন।' (তত্ত্ব..... ১২পৃঃ)* যে কথা মুহাদ্দিসীনগণ বলেননি, সে কথা অনুবাদ পড়ে বলে দিলেন! এটিও যেন এক অলৌকিক ও অসাধারণ ধারণা!

ইবনে সাইয়াদ ও দাজ্জাল একই লোক নয়, মদীনার একটি লোককে দাজ্জাল ধারণা করা হয়েছিল মাত্র। সুতরাং তার আসলত্বে অবিশ্বাস জন্মাবে কেন?

নূর আলম সাহেবের অভিমত, *'ঈসা আঃ ও মূসা আঃ এর সঙ্গে মেহেরাজে অবস্থানরত ছিল দাজ্জাল।' (তত্ত্ব..... ১৪পৃঃ)*

আছে কোথাও এক সঙ্গে থাকার কথা? পাঠক লক্ষ্য করুন হাদীস ঃ-

رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي مُوسَى رَجُلًا آدَمَ طُوَالًا جَعْدًا كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ وَرَأَيْتُ عِيسَى رَجُلًا مَرْبُوعًا مَرْبُوعَ الْخَلْقِ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ سَبِطَ الرَّأْسِ وَرَأَيْتُ مَالِكًا خَازِنَ النَّارِ وَالدَّجَّالَ فِي آيَاتٍ أَرَاهُنَّ اللَّهُ إِيَّاهُ {فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ}

মহানবী ﷺ বলেন, "যে রাতে আমাকে ইসরায় নিয়ে যাওয়া হয়, সে রাতে আমি মূসাকে দেখি, তিনি ছিলেন দীর্ঘদেহী বাদামী রংবিশিষ্ট ও কোঁকড়ানো চুলবিশিষ্ট। ঠিক যেন তিনি শানূআহ গোত্রের লোক। আমি ঈসাকেও দেখলাম, মাঝারি উচ্চতাসম্পন্ন সাদা-লালে মিশ্রিত মধ্যমদেহী এবং মাথার চুল সোজা। দোযখের দারোগা ও দাজ্জালকেও দেখলাম। আল্লাহ সে রাতে যে সকল নিদর্শন দেখিয়েছেন, সেগুলির মধ্যে এ হল কয়েকটি। (আল্লাহ বলেন,) 'সুতরাং তাঁর সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে তুমি সন্দিহান হয়ো না।" *(বুখারী ৩২৩৯নং)*

উক্ত বর্ণনায় কি দাজ্জালকে ভাল লোক অথবা সে মূসা-ঈসার (মেহেরাজের) সাথী লোক বলে প্রমাণিত হচ্ছে? সুতরাং এমন 'তাহকীক' কি ধোঁকা নয়?

রসূলের সাথে দাজ্জালের তওয়াফের ব্যাপারে যখন বর্ণনা অসঙ্গতিপূর্ণ মনে হচ্ছে, তখন

সহীহ হাদীসকে উড়িয়ে না দিয়ে উলামাদের কাছে ব্যাখ্যা নিন। তার কোন সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাখ্যা খুঁজে বের করুন। যেমন ঃ-

১। এটা হল স্বপ্নের কথা। জীবিত ও জাগরণ অবস্থায় সে মক্কা-মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না।

২। তওয়াফ করলেই দাজ্জাল ভাল লোক ধারণা করা ভুল। কারণ মক্কা বিজয়ের পূর্বে কাফের-মুশরিকরাও তওয়াফ করত, বরং উলঙ্গ নারী-পুরুষও তওয়াফ করত।

৩। স্বপ্নে একই সময় ঈসা ﷺ ও দাজ্জালকে তওয়াফ করতে দেখা গেছে অতএব তাদের আপোসে কোন পার্থক্য নেই---এ ধারণা ভুল। বিধায় নূর আলম কথিত *'গ্রীনরুমে একই পাত্রে নাস্তা খাওয়া এবং স্টেজে এসে পরস্পর যুদ্ধ করার' (তত্ত্ব..... ১৪পৃঃ)* উদাহরণটি পরিহাস বৈ কিছু নয়।।

আসলে বর্ণনাসমূহকে গঠনমূলক করেন মুহাদ্দিসীনগণ। তাঁরাই বিভিন্ন বর্ণনার বিভ্রান্তির বেড়াজাল থেকে মুসলিম উম্মাহকে রক্ষা করেন। তাঁদেরকে এড়িয়ে অথবা কলা দেখিয়ে আপনি সরাসরি কুরআন-হাদীস বুঝতে গেলে অধিক বিভ্রান্ত হবেন। আর *'সম্ভবতঃ এই ছিল, মনে হয় এই ছিল'* বলে জ্ঞানের আলো ছেড়ে কল্পনা ও ধারণার অন্ধকার জগতে বিচরণ হবে।

নূর আলম সাহেব বলেন, *'দাজ্জালের স্থায়ী ঠিকানা নাই।' (তত্ত্ব...... ১৫পৃঃ)*

দাজ্জালের স্থায়ী ঠিকানা নিয়ে কী করবেন? তার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার তো আমাদের দরকার নেই। বরং তার নাম শুনলেই যথাসম্ভব তার কাছাকাছি না হওয়ার চেষ্টা করতে হবে আমাদেরকে; নচেৎ ফিতনায় পড়তে হবে। তবুও হাদীসে বলা হয়েছে, দাজ্জাল খুরাসানে আবির্ভূত হবে। *(সিলসিলাহ সহীহাহ ১৫৯১নং)* কিন্তু তার আসলত্বের পরিচিতি ও প্রচার হবে ইরাক ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী এলাকায়। *(মুসলিম ২১৩৭নং)*

নূর আলম সাহেবের জিজ্ঞাসা, *'বর্তমানে সে কোথায় আছে?' (তত্ত্ব...... ১৫পৃঃ)*

বর্তমানে সে রূহের জগতে আছে। পূর্বে যাদেরকে দেখা গেছে তারা দাজ্জাল নয়। মি'রাজ ও স্বপ্নের দেখা, আদম ﷺ-এর দাউদ, মুহাম্মাদ (আলাইহিমাস সালাম)কে দেখার মত। মহানবী ﷺ-এর অন্যান্য নবীদেরকে দেখার মত, কিছু জাহান্নামী দেখার মত। ইত্যাদি।

নূর আলমের প্রশ্ন, *'তার বয়স কত?' (তত্ত্ব...... ১৫পৃঃ)*

তার বয়স আপনার-আমার বয়সের মতোই। আদম-হাওয়া ছাড়া দাজ্জালের বয়স এবং অন্যান্য মানুষ সকলের (রূহের) বয়স সমান।

নূর আলমের সিদ্ধান্ত, *'মহান আল্লাহ দুনিয়া দখল করার ক্ষমতা কোন নবী ও রসূলকে দেননি।' (তত্ত্ব...... ১৬পৃঃ)*---এ কথার দলীল কী? কুরআনের ঐ আয়াত তার দলীল নয়। গায়বী বিষয়ের সাথে সারা দুনিয়ার মালিক হওয়ার সাথ কী?

পরীক্ষা স্বরূপ আল্লাহ দাজ্জালকে সারা দুনিয়ায় স্বাধীনতা দেবেন, দখল করার ক্ষমতা নয়। পরন্তু ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে, পূর্বে চার ব্যক্তি দুনিয়ার মালিক হয়েছে। তাদের মধ্যে দু'জন মু'মিন ঃ সুলাইমান ও যুলক্বারনাইন এবং দু'জন কাফের ঃ নমরূদ ও বুখতে নাস্র। *(তফসীর বাহরুল মুহীত্ব ৬/১১৬ প্রভৃতি)*

নূর আলম সাহেব বলেছেন, *'দাজ্জালের কথা কুরআনে আসেনি।' (তত্ত্ব......সংযোজনী ২পৃঃ)* কিন্তু দ্বিতীয় অহীতে যখন সে কথা এসেছে, তখন মু'মিনদের সে কথা মেনে নেওয়া ওয়াজেব। আর মেনে নিতে বাধা কোথায়? এতে তার দ্বীন-দুনিয়ার কোন্ ক্ষতি সাধিত হবে?

আল-কুরআনে তো বহু কিছু আসেনি। তা বলে কি সে সব অস্বীকার করবেন, যদিও তা সহীহ হাদীসে এসেছে?

আল-কুরআনে অধিকাংশ নবীর নাম আসেনি, তাহলে তাঁদের প্রতি কি ঈমান রাখবেন না?

আল-কুরআনে মাক্বামে ইব্রাহীমের কথা এসেছে, কিন্তু হাজারে আসওয়াদ ও যমযমের কথা

আসেনি, তাহলে কি তার প্রকৃতত্বকে অমান্য করবেন?

আল-কুরআনে তো 'মেহেরাজ' (মি'রাজ) শব্দ আসেনি, তা বলে কি তা অবিশ্বাস করবেন?

আপনি যদি বিশ্বাস না করেন, না করতে পারেন। কিন্তু মু'তাযিলা ফির্কার বিশ্বাস আহলে সুন্নাহর ঘাড়ে কেন চাপাতে চান? আকরাম খাঁয়ের আশ্রম থেকে আক্কেলের ঘোড়ায় চড়ে যুক্তির চাবুক মেরে সহীহ হাদীস তথা ইসলামের সাহাবা, তাবেঈন, আয়েম্মা, মুহাদ্দিসীন, মুফাস্‌সিরীন ও হক্কানী উলামার উপর আক্রমণ কেন চালান? ইসলামের দরদে, নাকি ইসলামকে বস্তুবাদের কাছাকাছি করার লক্ষ্যে?

নূর আলম বলেছেন, *'সে .....জন্ম নেবে..... না অবতরণ করবে? এর কোন সুব্যাখ্যা হাদীসে নাই। কাজেই দাজ্জালের বর্ণনাগুলি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।' (তত্ত্ব......সংযোজনী ২পৃঃ)*

বাঃ! যুক্তিবাদীদের কী চমৎকার যুক্তি! মুখের জোরে ও কলমের ক্ষুরে উড়িয়ে দিতে পারলেই তো হল। যেহেতু সেই কিয়ামত ছাড়া তার হিসাব নেওয়ার তো কেউ নেই। অথচ কোন বিষয়ের বিশদ বর্ণনা না থাকলেও সহীহ দলীলকে ভিত্তি ক'রে তার প্রতি ইজমালী ঈমান আনতে আমরা বাধ্য।

ঐ দেখুন না, 'ইয়া'জূজ-মা'জূজ' ও 'দা-ব্বাতুল আর্য়' সম্বন্ধে আমরা বিস্তারিত কিছু জানতে পারি না, তবুও তা কুরআনে এসেছে বলে ঈমান রাখি। অতএব দাজ্জালের কথা সহীহ হাদীসে আসার কারণে তার এত সব গায়বী খুঁটিনাটি ব্যাপার যদি না-ই জানতে পারলাম, তাহলে কি তার আগমনের প্রতি ঈমান রাখা জরুরী নয়?

ইমাম মাহদী

যুক্তিবাদীরা ইমাম মাহদীর আগমনকে অস্বীকার করেছেন, অথচ তা অবিশ্বাস্য বিবেক-বহির্ভূত নয়।

শিয়াপন্থীরাও নিজেদের মতের সমর্থনে বহু হাদীস গড়েছে। কিন্তু ইমাম মাহদীর হাদীস তাদের গড়া নয়। কারণ ঐ ইমাম ও তাদের ইমামের মাঝে নাম ছাড়া অন্য কোন সাদৃশ্য নেই।

নূর আলম বলেন, *'শিয়াদের ইমাম মেহেদী হলেন তাদের ১২তম ইমাম। তাদের মতে তিনি অন্তর্ধান হয়েছেন। তাঁকে জীবিত অথবা মৃত খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাদের মতে তিনি ফিরে আসবেন।' (তত্ত্ব...... ১৭পৃঃ)* তাই শিয়ারা সিরদাবের দরজায় তাঁর অপেক্ষা ক'রে প্রত্যহ আশায় থেকে বলে, 'উখরুজ ইলাইনা ইয়া মাওলানা!' (আপনি আমাদের মাঝে আবির্ভূত হন, হে আমাদের সর্দার!) অতঃপর নিরাশ হয়ে ফিরে আসে।

পক্ষান্তরে সহীহ হাদীসে যে ইমামের কথা আছে, তিনি জন্ম নেবেন। আহলে বায়ত হযরত ফাতেমার বংশে তাঁর জন্ম হবে। আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নাম ও তাঁর নাম এবং উভয়ের পিতার নাম এক হবে। তিনি বড় সুদর্শন পুরুষ হবেন। আল্লাহ তাঁর দ্বারায় ইসলামের সার্বিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করবেন। তিনি ন্যায়পরায়ণ বাদশা হবেন। তখন পৃথিবী শান্তি ও ইনসাফে ভরে উঠবে। যেমন, তাঁর আগে অশান্তি ও যুলমে পরিপূর্ণ থাকবে। *(সহীহুল জামে' ৫১৮০নং)*

যদি মাহদী, ঈসা ও দাজ্জালের আগমনকে সত্য বলে মেনে নেওয়া হয়, তাহলে আপনার ঈমান ও ইসলামের কী ক্ষতি হবে? পক্ষান্তরে যদি মেনে না নেন, তাহলে সহীহ হাদীসকে অস্বীকার করা হবে। আর তার পরিণাম নিশ্চয়ই শুভ নয়। ইয়া'জূজ-মা'জূজের কথা তো

কুরআনে আছে। কিন্তু তার সঠিক হদীস কি পেয়েছেন? যুল-ক্বারনাইনের প্রাচীরের সন্ধান কি লাভ করেছেন? সুতরাং গায়বী বিষয়ে গায়বীভাবে ঈমান রাখতে দোষ কি? বস্তুবাদী হঠকারী ছাড়া সহীহ প্রমাণ থাকতেও কোন মুসলিম কি তা অস্বীকার করে? ভবিষ্যতে একজন ন্যায়পরায়ণ বাদশা আগমন করবেন---এই বিশ্বাসে কি ইসলাম অযৌক্তিক হয়ে যায়?

ঈসা ﷺ-এর পুনরাগমন

যুক্তিবাদীদের প্রতিভূ নূর আলমের দাবী, ঈসা ﷺ-এর পুনরাগমনের কথা *'বাইবেলে আছে, কুরআনে নেই।' (তত্ত্ব...... ১৯পৃঃ)*

কুরআন পূর্বের কিতাবগুলিকে বিকৃত করা হয়েছে বললেও তার সকল তথ্যকে মিথ্যা বলেনি। বিশেষ ক'রে যে তথ্যের সমর্থন কুরআন ও সহীহ হাদীসে রয়েছে, সে তথ্য মুসলিমদের বিশ্বাস করতে কোন বাধা নেই। এ কথা যুক্তিযুক্ত নয় যে, কোন কথা পূর্ববর্তী কিতাবে আছে বলেই, সে কথা আমাদের কিতাবে থাকলে তা ভুল বা অবাস্তব; বিশ্বাসের অযোগ্য। মহানবী ﷺ-এর সুসংবাদ যে সকল পূর্ববর্তী কিতাবে আছে, সেগুলির তথ্য কি ভুল বলতে পারবেন?

যদি কোন খবর পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবে থাকে এবং আমাদের কুরআন অথবা সুন্নাহতে তার সমর্থন পাওয়া যায়, তাহলে তা মানতে বা বিশ্বাস করতে কোন দোষ নেই। সে কথা তওরাত-ইঞ্জীল আসমানী গ্রন্থে আছে বলেই তা ভিত্তিহীন হয় না। এমন বহু কথা কুরআনে আছে, যা তওরাত-ইঞ্জীলে আছে। যাতে মনে হয়, পূর্ববর্তী কিতাবগুলি মনুষ্য কর্তৃক বিকৃত হলেও তার কিছু কিছু তথ্য আসমানী থেকে গেছে। আর তারই সমর্থন কুরআন করেছে। অনুরূপভাবে যদি কোন কথার সমর্থন সহীহ হাদীস দ্বারা হয়ে থাকে, তাহলে তা মানতে বা বিশ্বাস করতে 'আধুনিক ঈমান' নষ্ট হবে কেন?

শুধু বিশ্বাসই নয়, পূর্ববর্তী আসমানী শরীয়তও আমাদের শরীয়ত; যদি আমাদের শরীয়তে তা মনসূখ না হয়। বরং মহানবী ﷺ বলেছেন, "আমার নিকট থেকে পৌঁছে দাও; যদিও তা একটি আয়াত হয়। বানী ইস্রাঈল থেকে হাদীস বর্ণনা কর, কোন দোষ নেই। আর যে ব্যক্তি আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করবে, সে যেন নিজের ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নেয়।" *(আহমাদ ৬৪৮৬, বুখারী ৩৪৬১, তিরমিযী ২৬৬৯নং)*

নূর আলমের লিখিত একবাক্যে *'তখনকার আলেম থেকে শুরু করে আজকের আলেম পর্যন্ত সকল আলেমই হয় কোরাণ ঠিকমত পড়েননি, না হয় কোরাণ আদৌ বোঝেননি' (তত্ত্ব......২০পৃঃ)* বলা কি নেহাতই বেআদবী ও দুঃসাহসিকতার পরিচয় নয়? 'কোরাণ' কি আপনি আর আপনার রূহানী উস্তাযগণ একাই বুঝলেন? কুরআনের এক শ্রেণীর অনুবাদ পড়েই কুরআন-বুঝিলকার হয়ে গেলেন? সুবহানাকা হাযা বুহতানুন আযীম।

সত্যই মুসলিম সমাজ বড় বিভ্রান্তি ও ধোঁকার শিকার। সমাজ বড় বোকা। এ সমাজ রসূল, সাহাবা, তাবেঈন, আয়েম্মাহ, মুহাদ্দিসীন, মুফাস্সিরীন ও উলামায়ে কিরাম থেকে ইসলাম গ্রহণ করেছে; যাঁরা 'কোরাণ'ই পড়েননি অথবা বোঝেননি!

হ্যাঁ, বোকা বলেই তো সমাজ তাদেরকে কথা বলার সুযোগ দেয় অথবা তাদের কুযুক্তিযুক্ত কুচিন্তার কথা নীরবে মেনে নেয়, যারা আরবী অনুবাদ পড়ে 'মুজতাহিদ' সেজে বসে নিজ ময়দানের বাইরে আক্কেলের ঘোড়া ছোটায়!

হ্যাঁ, এ তো নতুন বিশ্বের প্রত্যেক মানুষের অধিকার। চিন্তা-স্বাধীনতা, বাক্-স্বাধীনতা, যৌন-স্বাধীনতা না পেলে যে মানুষ পরাধীন থেকেই যায়। সুতরাং শ্রদ্ধেয়দেরকে শ্রদ্ধা করবে কেন? স্বেচ্ছাচারিতা যে বড় পবিত্র; বিশেষ ক'রে ভারতবর্ষের মতো (আসল অর্থে) 'ধর্মনিরপেক্ষ' দেশে।

নূর আলম লিখেছেন, *'মহান আল্লাহ আমাদেরকে সতর্ক করেছেন, যাতে আহলে কিতাবরা আমাদেরকে 'কাফির' বানিয়ে না ফেলে।' (তত্ত্ব.....২০পৃঃ)* কিন্তু ঈসা ﷺ-এর পুনরাগমনকে বিশ্বাস করলে 'কাফির' হতে হয়, তার প্রমাণ কী? পক্ষান্তরে তাঁর পুনরাগমনকে অবিশ্বাস করলেই মানুষ 'কাফির' হতে পারে; কারণ সে অবিশ্বাসী সহীহ হাদীসকে অস্বীকার করে।

পক্ষান্তরে কুরআনে তাঁর পুনরাগমনের ইঙ্গিত রয়েছে। আর সেই ইঙ্গিতকে স্পষ্ট ক'রে দিয়েছে সহীহ হাদীস। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ} (٥٥)

অর্থাৎ, (স্মরণ কর) যখন আল্লাহ বললেন, 'হে ঈসা! নিশ্চয় আমি তোমার নির্দিষ্ট কাল পূর্ণ করব এবং আমার কাছে তোমাকে তুলে নেব এবং যারা অবিশ্বাস করেছে, তাদের মধ্যে থেকে তোমাকে পবিত্র (মুক্ত) করব। আর তোমার অনুসারিগণকে কিয়ামত পর্যন্ত অবিশ্বাসীদের উপর জয়ী করে রাখব, অতঃপর আমার কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন (ঘটবে)। তারপর যে বিষয়ে তোমাদের মতান্তর ঘটেছে, তার মীমাংসা করে দেব। *(সূরা আলে ইমরান ৫৫ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেছেন,

{وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ} (٦١) سورة الزخرف

অর্থাৎ, নিশ্চয় ঈসা কিয়ামতের একটি নিদর্শন; সুতরাং তোমরা কিয়ামতে অবশ্যই সন্দেহ পোষণ করো না এবং আমার অনুসরণ কর। এটিই সরল পথ। *(সূরা যুখরুফ ৬১ আয়াত)*

কিয়ামতের 'নিদর্শন' হয়ে তিনি এ পৃথিবীতে পুনরায় অবতরণ করবেন, সে কথা হাদীসে বলা হয়েছে; যে সহীহ হাদীসকে মু'তাযিলাপন্থী বাস্তববাদীরা অস্বীকার করেছেন।

পক্ষান্তরে আয়াতের মূল শব্দ 'ইল্ম' বা 'আলাম' শব্দের (ক্ষমতা নেই বলে) তাহকীক না ক'রে তার এক অনুবাদ 'অগ্রদূত' নিয়ে তাহকীক ক'রে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, তিনি তো অগ্রেই দূত বা রসূল হয়েই চলে গেছেন! কিন্তু 'অগ্রদূত' দ্বারা উপলব্ধ অর্থ কি ঐ 'ইল্ম' বা 'আলাম' শব্দে আছে?

'অগ্রদূত' মানে অব্যবহিত পূর্বে পাঠানো বা আসা দূত। এখানে বাংলাতে 'দূত' মানে নবী বা রসূল নয়। যেমন চুম্বনকে মিলনের অগ্রদূত বা পূর্বদূত বলা হয়। আর সে 'দূত' মানে নবী বা রসূল নয়। 'কিয়ামতের অগ্রদূত' মানে তিনি কিয়ামতের আগে তার খবর নিয়ে আসবেন। তিনি তার নিদর্শন হয়ে আসবেন।

তিনি এ পৃথিবীতে আসবেন এবং স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করবেন, সে কথা অন্য এক আয়াতে মহান আল্লাহ আরো পরিষ্কার ক'রে বলেছেন,

{وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا}

অর্থাৎ, গ্রন্থধারীদের প্রত্যেকেই তার মৃত্যুর পূর্বে তাকে (ঈসাকে) বিশ্বাস করবেই এবং কিয়ামতের দিন সে (ঈসা) তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হবে। *(সূরা নিসা ১৫৯ আয়াত)*

এই আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তাআলা নিজের অলৌকিক শক্তি

দ্বারা ঈসা ﷺ-কে জীবিত অবস্থায় সশরীরে আসমানে তুলে নিয়েছেন। বহুধা সূত্রে বর্ণিত হাদীসেও এ কথা প্রমাণিত আছে। এ সকল হাদীস হাদীসের সমস্ত গ্রন্থ ছাড়াও বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। সে সব হাদীসে ঈসা ﷺ-কে আসমানে তুলে নেওয়া ছাড়াও পুনরায় প্রলয় দিবসের প্রাক্কালে পৃথিবীতে তাঁর অবতরণ এবং আরো বহু কথা তাঁর ব্যাপারে উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম ইবনে কাসীর (রহঃ) এই সমস্ত হাদীসগুলিকে বর্ণনা করার পর শেষে লিখেছেন যে, উল্লিখিত হাদীসগুলি রসূল ﷺ হতে বহুধা সূত্রে প্রমাণিত। এই হাদীসগুলির বর্ণনাকারিগণ হলেন ঃ আবু হুরাইরাহ, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, উসমান বিন আবুল আ'স, আবু উমামা, নাওয়াস বিন সামআন, আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আ'স, মুজাম্মে' বিন জারিয়াহ, আবূ সারীহাহ এবং হুযাইফা বিন উসায়েদ ﷺ প্রমুখ সাহাবাবৃন্দ। এই সমস্ত হাদীসে তিনি কোথায় ও কিভাবে অবতরণ করবেন তা উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি দিমাশকের মিনারা শারক্বিয়াতে ফজরের নামাজের ইকামতের সময় অবতরণ করবেন। তিনি শূকর হত্যা করবেন, ক্রুস ভেঙ্গে ফেলবেন ও জিযিয়া কর বাতিল ক'রে দেবেন। তাঁর শাসনামলে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ মুসলমান হয়ে যাবে। তিনিই দাজ্জালকে হত্যা করবেন, তাঁর যুগেই ইয়া'জূজ ও মা'জূজ ও তাদের ফিতনা-ফাসাদের প্রকাশ ঘটবে এবং তাঁর বদ্দুআতে তারা বিনাশ ও ধ্বংস হয়ে যাবে।

আলোচ্য আয়াতে (قبل موتــه) এর মধ্যে ةُ (তার) সর্বনামটি থেকে কিছু মুফাস্‌সিরগণের মতে খ্রিষ্টানকে বুঝানো হয়েছে। এমতাবস্থায় আয়াতের ব্যাখ্যা এই যে, প্রত্যেক খ্রিষ্টানই নিজ অন্তিম মুহূর্তে ঈসা ﷺ-এর নবুঅতের সত্যতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনবে। কিন্তু সেই মুহূর্তের ঈমান তাদের আদৌ কোন উপকারে আসবে না। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা যা সালাফ ও বহু মুফাস্‌সির কর্তৃক সমর্থিত, তা হলো موته (তার মৃত্যু) শব্দের সর্বনামে ঈসা ﷺ-এর মৃত্যুর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ হবে, যখন তিনি দ্বিতীয়বার দুনিয়াতে অবতরণ করবেন এবং দাজ্জালকে হত্যা করার পর, ইসলামের প্রচার ও প্রসার কাজে মগ্ন হবেন এবং ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের মধ্যে যারা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করবে, তাদেরকে নিধন ও নিশ্চিহ্ন করবেন, সর্বত্র ইসলামের একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম হবে। অবশিষ্ট আহলে কিতাবরা ঈসা ﷺ-এর মৃত্যুর পূর্বেই তাঁর প্রতি যথাযথ ঈমান আনবে। সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, রসূল ﷺ বলেছেন, "যাঁর হাতে আমার জীবন আছে সেই সত্তার কসম! অবশ্যই এমন এক দিন আসবে, যেদিন তোমাদের মধ্যে ঈসা ইবনে মারয়্যাম একজন ন্যায়পরায়ণ শাসকরূপে অবতরণ করবেন, ক্রুস ভেঙ্গে চুরমার করবেন, শূকর নিধন করবেন, জিযিয়া কর বাতিল করবেন, মাল-সম্পদ এত বেশী হবে যে, (দান বা সাদকা) গ্রহণ করার মত লোক থাকবে না। সেই সময় একটি সিজদাহ্ দুনিয়া এবং তার মধ্যে যা কিছু রয়েছে তার থেকেও উত্তম হবে।" (অর্থাৎ, কিয়ামত নিকটে জানার কারণে ইবাদত মানুষের কাছে অতি প্রিয় হবে।) এ হাদীস বর্ণনার পর আবু হুরাইরাহ ﷺ বললেন, তোমরা ইচ্ছা করলে, কুরআন কারীমের এ আয়াত পাঠ করতে পার, (وَإِنْ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْــلَ مَوْتــه) অর্থাৎ, আহলে কিতাবদের মধ্যে প্রত্যেকে নিজ মৃত্যুর পূর্বে অবশ্যই তাঁর প্রতি ঈমান আনবে। *(বুখারী ঃ কিতাবুল আম্বিয়া, ৩৪৪৮-নং)* এই হাদীস এত অধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তার ফলে তা 'মুতাওয়াতির' হাদীসের পর্যায়ভুক্ত। আর এই 'মুতাওয়াতির' শুদ্ধ বর্ণনার ভিত্তিতেই আহলে সুন্নাহর সর্বসম্মত আক্বীদাহ মতে ঈসা ﷺ আসমানে জীবিত আছেন এবং কিয়ামতের প্রাক্কালে তিনি দুনিয়াতে আসবেন, দাজ্জালকে হত্যা করবেন, সমস্ত ধর্মের অবসান ঘটাবেন, সর্বত্র ইসলামের একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম

করবেন। ইয়া'জূজ ও মা'জূজ তাঁর সময়েই প্রকাশ হবে এবং তাঁর বদ্দুআর কারণে ইয়া'জূজ ও মা'জূজের ফিতনার অবসান ঘটবে। *(তফসীর আহসানুল বায়ান ১৫৪পৃঃ)*

সবচেয়ে বড় হাস্যকর উক্তি যে, *'সকল নবী ও রসূলগণই কেয়ামতের অগ্রদূত।'* আদম ﷺ থেকে নিয়ে মুহাম্মাদ ﷺ পর্যন্ত সবাই 'কিয়ামতের অগ্রদূত', তাহলে পশ্চাতের দূত কে থাকল? অগ্রের অর্থ কি থাকল? আয়াতে সে কথার উল্লেখ কেন এল? আয়াতের উপকারিতাটা কি? ধারণাবশে 'হয়তো' 'সম্ভবত' বলে কি শিক্ষিত সমাজকে বোঝানো যায়? মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنًّا إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللّهَ عَلَيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ}

অর্থাৎ, তাদের অধিকাংশ লোক শুধু ধারণার অনুসরণ করে; নিশ্চয়ই বাস্তব ব্যাপারে ধারণা কোন কাজে আসে না। তারা যা করছে নিশ্চয়ই আল্লাহ সে বিষয়ে সুপরিজ্ঞাত। *(সূরা ইউনুস ৩৬ আয়াত)*

যদি বলেন, 'আমি আয়াতের দ্বিতীয় তফসীর মানি', তাহলে আমরা বলব, 'প্রথম তফসীরকে অমান্য করবেন কেন? আপনার মনঃপূত নয় বলে?'

নূর আলম সাহেব বলেছেন, *মহানবী সঃ বলিয়াছেন, "আমি যাহা বলিব অন্ধের ন্যায় তাহার অনুসরণ করিবে না। তা সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত কথা কি না প্রথমে তাহা তাহ্‌কীক করিয়া লইবে। যদি তোমরা তাহাকে ন্যায়সঙ্গত কাজ বলিয়া মনে কর, তবেই তাহার অনুসরণ করিও। (মোস্তফা চরিত ৪৬১-৪৬২পৃঃ) 'অথচ তাহকীকের ব্যাপারে বর্ণনাকারী, লেখক, পাঠক, প্রচারক ও শ্রোতা সকলেই চরম অবহেলা করেছি, যার ফলে মিথ্যা জাল গল্পগুলিও ইসলাম ধর্মের প্রধান অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে।' (তত্ত্ব...... ১৫পৃঃ)*

যে নবী ﷺ শরীয়তের ব্যাপারে নিজের মনগড়া কিছু বলেন না, সেই নবীর কথা তাহকীক কে করবে? মু'তাযিলা ও আকরাম খাঁয়ের মত আলেম ও তাঁর অন্ধ অনুসারীরা?

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى (١) مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى (٢) وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُـــوَ إِلَّـــا وَحْيٌ يُوحَى (٤) عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى} (٥) سورة النجم

অর্থাৎ, শপথ নক্ষত্রের, যখন তা অস্তমিত হয়। তোমাদের সঙ্গী বিভ্রান্ত নয়, বিপথগামীও নয় এবং সে মনগড়া কথাও বলে না। তা তো অহী, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়। তাকে শিক্ষা দান করে চরম শক্তিশালী, (ফিরিশ্‌তা জিব্রাঈল)। *(সূরা নাজম ১-৫ আয়াত)*

সুতরাং ঐ হাদীস কি জাল ও ভিত্তিহীন নয়? নাকি মনের খোরাক বলে ঐ অচল হাদীসকে মানা যাবে?

পক্ষান্তরে জনাব! দাজ্জাল আসবে, ইমাম মাহদী নামক এক ইমাম আসবেন, ঈসা নবী আসবেন---এ কথা বিশ্বাস করা কি অযৌক্তিক? বিজ্ঞানের যুক্তিতে তা যুক্তিসঙ্গত না হলে, বিজ্ঞান তো জ্বিন, ফিরিশ্‌তা, পুনরুত্থান, পুনরুজ্জীবন কিছুকেই স্বীকার করে না। আপনিও কি তাই করবেন? যদি তাই হয়, তাহলে বলার কিছু নেই।

নূর আলম সাহেব লিখেছেন, *'তবে এ কথা সত্য যে, সে যুগের লেখকগণ আজকের মত এতটা সুযোগ-সুবিধা পাননি। সে কারণে যাচাই-বাছাই করার অবকাশও তাঁরা পাননি।' (তত্ত্ব...... ১৫পৃঃ)*

বড় আশ্চর্য কথা! আজকে তাহকীক করার মত সুযোগ-সুবিধার যন্ত্র কী পেয়ে গেলেন? কী সেই 'পরশমণি' যার পরশে তাহকীক ক'রে সহীহ হাদীসকেও এমনকি কুরআনের প্রকাশ্য উক্তিকেও উড়িয়ে দেওয়া যায়? কোন্ মানদণ্ডে আপনি ঠিক-বেঠিককে ওজন করবেন? বৈজ্ঞানিক, নাকি বেজ্ঞানিক? কোন্ কষ্টিপাথরে আপনি বিচার করবেন, সে সকল কাহিনী বাস্তব

না গল্প? স্বেচ্ছাচারিতার, না অনুসরণের?

পরন্তু ঐ তাহকীকও তো পুরনো। মুসলিম সমাজ এ কথা বিশ্বাস করে না যে, অনুরূপ সহীহ হাদীস অস্বীকারকারী আক্কেল আলীদের দাবী আজকের আধুনিক। সেই মু'তাযিলা, জাহমিয়্যাহ প্রভৃতি ফির্কার তাহকীক আজকের ঐ আধুনিক তাহকীক। বাংলার মাটির মুসলমান গত ৫০/৬০ বছর আগে ঐ সকল যুক্তি ও তাহকীক শুনেছে এবং যে ঈমান খারাপ করার সে করেছে, বাকী যাঁরা খণ্ডন করার তাঁরা তা করেছেন এবং আহলে সুন্নাহর ঈমান বহাল রেখেছেন। তার কিছু অংশ আমরা উদ্ধৃত করেছি।

আগেই বলেছি, জাল হাদীসের জঞ্জাল থেকে সহীহ হাদীসকে মুক্ত করার জন্য কারো বিবেক-বুদ্ধি, যওক-যুক্তি, ধারণা-বাসনা ফলপ্রসূ নয়। তার জন্য একমাত্র ফলপ্রসূ ছিল ইলমুল ইসনাদ, ইলমুর রিজাল, ইলমুল জারহি অত-তা'দীল ইত্যাদি। আর তারই ফল স্বরূপ মুহাদ্দিসীনগণ চিহ্নিত করেন সহীহ-যয়ীফ। তারই সারনির্যাস হল সহীহায়ন (বুখারী-মুসলিম)।

নূর আলমের যুক্তি, *'এত বড় সম্মানের পদে আসীন হওয়ার পর ইসা আঃকে সাধারণ ক'রে প্রেরণ করবেন এমন কথা প্রকৃত (?) ইমানদারগণের বিশ্বাস করা এবং মেনে নেওয়া বড়ই কষ্টকর এবং অসম্ভব।' (তত্ত্ব......২১পৃঃ)*

আল্লাহই জানেন, প্রকৃত ঈমানদার কে বা কারা? 'আল্লাহু আ'লামু বিঈমানিকুম।' ঈসা ﷺ জননেতা হয়ে পুনরাগমন করবেন, শেষ রসূল ও শ্রেষ্ঠ নবীর উম্মতি হয়ে আসবেন, তাতে তাঁর অসম্মানের কি আছে? এতে সম্মানের উপর আরো সম্মানের বৃদ্ধি, নূরের উপর নূর। এ কথা মেনে নিতে ঈমানদারদের কষ্টের কি আছে?

অতঃপর নূর আলমের সিদ্ধান্ত, *'ইমানের প্রশ্নে কোরাণ ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থের উপর বিশ্বাস করা ইমানদারের কাজ নয়।'*

এ কথা হল সে যুগের কুরআন-ভিত্তিক যুক্তিবাদীদের; যারা নিজেদের সীমিত জ্ঞানের নিকষে সহীহ হাদীস অস্বীকার করে। কুরআনের ব্যাখ্যা কেবল কুরআন হলে, অনেক আয়াত যুক্তিবাদীদের যুক্তিযুক্তি খেলায় পরিণত হবে, যেমন হয়েছেও। যেহেতু অধিকাংশ আয়াতের ব্যাখ্যা কুরআনে পাওয়া যায় না। কুরআনের ব্যাখ্যা হাদীসে আছে, আর সেই ব্যাখ্যা নিয়ে যুক্তিবাদীরা নামায-রোযা করেন। আবার সমস্ত ব্যাখ্যা হাদীসেও পাওয়া যায় না, ফলে সাহাবাগণের ব্যাখ্যাও নিতে হয়।

পাঠক বলুন তো, সহীহ হাদীস তথা সাহাবীর ব্যাখ্যাকে আপনি প্রাধান্য দেবেন, নাকি আপনার মনোগত, জ্ঞানগত ব্যাখ্যাকে? কী জানি আপনার মন ও জ্ঞান আবার কোন্ কোন্ ঘাটের জল খেয়ে খেয়ে পরিপক্বতা লাভ করেছে? কী গ্যারান্টি আছে যে, আপনার জ্ঞান ও যুক্তিটাই সঠিক?

বলাই বাহুল্য যে, দাজ্জাল, মাহদী ও ঈসা---এ তিনের আগমনের মৌলিক ভিত্তি হল সেই সহীহ হাদীস, যে সহীহ হাদীস মেনে যুক্তিবাদীরা নিয়মিত নামায পড়েন, রোযা রাখেন। তাঁরা অবশ্য হাদীস নামক (?) গ্রন্থগুলিকে একেবারেই বর্জন করতে পারেন না। নচেৎ হয়তো তাঁরা দিল-কা'বায় নামায পড়তেন অথবা যুক্তিযুক্ত সংখ্যক রাকআতে নামায পড়তেন এবং নিজেদের মতলব হাসিলের সময়---জাল বা যয়ীফ হলেও---হাদীস পেশ ক'রে তথাকথিত যুক্তিকে সমৃদ্ধ করতেন না।

প্রিয় পাঠক! তাহলে বলুন, তাঁরা কি কুরআন-ভিত্তিক যুক্তিবাদী, নাকি হাদীস-ভিত্তিক অথবা খামখেয়াল-ভিত্তিক?

স্বপ্ন

ইসলামী বিধানে যা পাওয়া যায়, তাতে বুঝা যায় যে, স্বপ্ন ৩ প্রকার ঃ-

১। সত্য স্বপ্ন ঃ যা আল্লাহর তরফ থেকে বান্দাকে দেখানো হয়। ফিরিশ্‌তা মানুষরূপে তার আত্মার সাথে কথা বলে অথবা উদাহরণ স্বরূপ কোন ঘটনা তাকে দেখানো হয়, অথবা আল্লাহর তরফ হতেই তার মনে সত্য কল্পনার ছবি ফুটে ওঠে এবং তা স্বপ্নে দৃষ্ট হয়। যা বাস্তবে সত্য ঘটে অথবা তার তা'বীর (তাৎপর্য) সত্য হয়। এই ধরনের স্বপ্ন নবুঅতের ৪৬তম অংশের এক অংশ। কারণ, সত্য স্বপ্ন নবুঅতের অহীর মত না হলেও তা আল্লাহরই তরফ হতে ইলহাম হয়। *(মুসলিম ২২৬৩)*

২। এমন বস্তুর স্বপ্ন দেখে যার ছবি মানুষ নিজ কল্পনায় ও খেয়ালে মনের পর্দায় খুব বেশীরূপে অঙ্কিত ও চিত্রিত করে থাকে। তাই যা কামনা অথবা আশঙ্কা করে তাই দেখে থাকে স্বপ্নে। এ ধরনের স্বপ্ন অলীক, যার কোনও তাৎপর্য নেই।

৩। এক ধরনের স্বপ্ন; যা দেখে মানুষ অত্যন্ত ভয় পায়। অথবা কষ্ট ও দুঃখ পায়। এ ধরনের স্বপ্ন শয়তানের তরফ থেকে হয়। কারণ, শয়তান মুসলিমকে কষ্ট ও দুঃখ দিয়ে খুব তৃপ্তি পায়। *(কুঃ ৫৮/১০)* যেহেতু শয়তান মুসলিমের প্রকৃত দুশমন।

শয়তানের স্বপ্ন দেখাবার ক্ষমতা আছে এবং তার মাধ্যমে মুসলিমকে ভ্রষ্ট অথবা দুঃখগ্রস্ত করতে পারে। নেক বান্দাদের উপর তার কোন আধিপত্য নেই ঠিকই। তবুও মহান আল্লাহ শয়তান থেকে আমাদেরকে সাবধান করেছেন। শয়তানের পদাঙ্কানুসরণ করতে নিষেধ করেছেন। শয়তান মানুষকে ভুলিয়ে দেয়, নবীকেও ভুলিয়ে দেয়। নবী ও মুসলিমকে কষ্ট দেয়। উদাহরণ স্বরূপ ঃ-

ঐ (বক্তা) তো শয়তান; যে (তোমাদেরকে) তার (কাফের) বন্ধুদের ভয় দেখায়; সুতরাং যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তাহলে তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, বরং আমাকেই ভয় কর। *(সূরা আলে ইমরান ১৭৫ আয়াত)*

তাদেরকে পথভ্রষ্ট করবই; তাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করবই, আমি তাদেরকে নিশ্চয় নির্দেশ দেব, ফলে তারা পশুর কর্ণচ্ছেদ করবেই এবং তাদেরকে নিশ্চয় নির্দেশ দেব, ফলে তারা আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করবেই।' আর যে আল্লাহর পরিবর্তে শয়তানকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবে, নিশ্চয় সে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করে। আর শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়, তা ছলনা মাত্র। *(সূরা নিসা ১১৯-১২০)*

শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও নামাযে বাধা দিতে চায়! অতএব তোমরা কি নিবৃত্ত হবে না? *(সূরা মাইদাহ ৯১ আয়াত)*

স্মরণ কর, শয়তান তাদের কার্যাবলীকে তাদের দৃষ্টিতে সুশোভিত করেছিল এবং বলেছিল, 'আজ মানুষের মধ্যে কেউই তোমাদের উপর বিজয়ী হবে না, আর আমি অবশ্যই তোমাদের সহযোগী (প্রতিবেশী)।' অতঃপর দু'দল যখন পরস্পরের সম্মুখীন হল, তখন সে পিছু হটে সরে পড়ল ও বলল, 'নিশ্চয় তোমাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। নিশ্চয় আমি তা দেখি, যা তোমরা দেখতে পাও না। নিশ্চয় আমি আল্লাহকে ভয় করি।' আর আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর। *(সূরা আনফাল ৪৮ আয়াত)*

(ইউসুফ) তাদের মধ্যে যে মুক্তি পাবে মনে করল, তাকে বলল, 'তোমার প্রভুর কাছে আমার কথা বলো।' কিন্তু শয়তান তাকে তার প্রভুর কাছে তার বিষয় বলবার কথা ভুলিয়ে দিল; (অথবা

শয়তান ইউসুফকে তার প্রভুর স্মরণ ভুলিয়ে দিল।) সুতরাং (ইউসুফ) কয়েক বছর কারাগারে থেকে গেল। *(সূরা ইউসুফ ৪২ আয়াত)*

মূসার সাথী (তাকে) বলল, 'আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আমরা যখন শিলাখন্ডে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম, তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম? শয়তানই ওর কথা আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল; মাছটি আশ্চর্যজনকভাবে নিজের পথ করে সমুদ্রে নেমে গেল।' *(সূরা কাহফ ৬৩ আয়াত)*

আমি তোমার পূর্বে যে সব রসূল কিংবা নবী প্রেরণ করেছি তাদের কেউ যখনই আকাঙ্ক্ষা করেছে, তখনই শয়তান তার আকাঙ্ক্ষায় কিছু প্রক্ষিপ্ত করেছে। কিন্তু শয়তান যা প্রক্ষিপ্ত করে আল্লাহ তা বিদূরিত করেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহকে সুদৃঢ় করেন এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। *(সূরা হাজ্জ ৫২ আয়াত)*

স্মরণ কর, আমার দাস আইয়ুবের কথা, যখন সে তার প্রতিপালককে আহবান করে বলেছিল, শয়তান তো আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্টে ফেলেছে। *(সূরা স্বা-দ ৪১ আয়াত)*

অবশ্য এ কথা সত্য যে, আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কোন ক্ষতিই হয় না, শয়তানও কোন ক্ষতি করতে পারে না; যদি না আল্লাহ চান।

শয়তানের দোহাই দিয়ে কেউ বাঁচতেও পারবে না। পাপ করলে তার শাস্তি ভুগতে হবে।

মোটকথা, অধিকাংশ স্বপ্ন মনের অবচেতন অবস্থার খেয়াল অথবা শয়তানের কারসাজি। আর প্রথম শ্রেণীর স্বপ্ন মু'মিনরা দেখে থাকে, যা ভাল স্বপ্ন এবং তা আল্লাহর তরফ থেকে দেখানো হয়। মহান আল্লাহ মুমিনের মনে যা ভালো দেখাবার ইচ্ছা তা প্রক্ষিপ্ত করেন। আর ভালোর মাপকাঠি হল শরীয়ত। তাকে সাবধান করেন, সতর্ক করেন, সুসংবাদ দেন ইত্যাদি। তবে স্বপ্ন দিব্য দর্শন নয়, স্বপ্নাদেশ কোন শরীয়ত নয়; যেহেতু শরীয়ত সম্পূর্ণ। বরং তার তাবীর ও ব্যাখ্যা করতে হয়। শয়তান স্বপ্ন দেখাতে পারে, যেহেতু সে তো আমাদের রক্তশিরায় চলমান হতে পারে। পক্ষান্তরে কোন মানুষ কাউকে স্বপ্ন দেখাতে পারে না।

আর মু'মিনের স্বপ্ন সত্য হওয়ার অর্থ এ নয় যে, সে যা দেখে তাই সত্য। ব্যভিচার করতে দেখলে তাই সত্য, পাপ করা দেখলে তার শাস্তি পাবে। বরং তার তা'বীর সঠিক হলে সত্যরূপে প্রকাশ পাবে। উদাহরণ স্বরূপ ঃ এক পাপী স্বপ্ন দেখল, সে স্বপ্নে পথ চলছে; কিন্তু তার পথ ভুল হয়ে যাচ্ছে অথবা যেখানে যাওয়ার কথা সেখানে সে পৌঁছতে পারছে না অথবা কোন ভয়ঙ্কর স্থানে সে পৌঁছচ্ছে। তখন কারো নিকট সে তার তা'বীর জানল যে, সে যে পথে চলছে, তা ভুল পথ। অতঃপর সে তওবা ক'রে খাঁটি মুসলিম ব্যক্তিতে পরিণত হল।

নবী ছাড়া অনবীর স্বপ্ন এবং তার তা'বীরের কথাও কুরআনে এসেছে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْراً وَقَالَ الآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزاً تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنْ الْمُحْسِنِينَ (٣٦) قَالَ لا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلاَّ نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي ...... يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْراً وَأَمَّا الآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ (٤١)

অর্থাৎ, তার সাথে দু'জন যুবক কারাগারে প্রবেশ করল। তাদের একজন বলল, 'আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি (আঙ্গুর) নিঙড়ে মদ তৈরী করছি' এবং অপরজন বলল, 'আমি স্বপ্নে দেখলাম আমি আমার মাথায় রুটি বহন করছি এবং পাখি তা হতে খাচ্ছে। আমাদেরকে আপনি এর তাৎপর্য জানিয়ে দিন, আমরা আপনাকে সৎকর্মপরায়ণ দেখছি।' ইউসুফ বলল, 'তোমাদেরকে যে খাদ্য দেওয়া হয়, তা আসবার পূর্বে আমি তোমাদেরকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানিয়ে দেব, এ জ্ঞান

আমার প্রতিপালক আমাকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তারই অন্তর্ভুক্ত। ......হে আমার কারাসঙ্গীদ্বয়! তোমাদের একজন সম্বন্ধে কথা এই যে, সে তার প্রভুকে মদ্য পান করাবে এবং অপরজন সম্বন্ধে কথা এই যে, সে শূলবিদ্ধ হবে, অতঃপর তার মস্তক হতে পাখি আহার করবে। যে বিষয়ে তোমরা জানতে চেয়েছ তার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে।' *(সূরা ইউসুফ ৩৬-৪১ আয়াত)*

একই ঘটনা-বিবরণে তিনি আরো বলেন,

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ (٤٣) قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الأَحْلامِ بِعَالِمِينَ (٤٤) وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ (٤٥) يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ (٤٦) قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَباً فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلاَّ قَلِيلاً مِمَّا تَأْكُلُونَ (٤٧) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلاَّ قَلِيلاً مِمَّا تُحْصِنُونَ (٤٨) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ (٤٩)

অর্থাৎ, রাজা বলল, 'আমি স্বপ্নে দেখলাম, সাতটি স্থূলকায় গাভী; ওগুলিকে সাতটি শীর্ণকায় গাভী ভক্ষণ করছে এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অপর সাতটি শুষ্ক। হে প্রধানগণ! যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে পার, তাহলে আমার স্বপ্ন সম্বন্ধে অভিমত দাও।' তারা বলল, 'এটা আবোল-তাবোল স্বপ্ন এবং আমরা এরূপ স্বপ্ন ব্যাখ্যায় অভিজ্ঞ নই।' দু'জন কারা-বন্দীর মধ্যে যে মুক্তি পেয়েছিল এবং দীর্ঘকাল পরে তার স্মরণ হল, সে বলল, 'আমি এর তাৎপর্য তোমাদেরকে জানিয়ে দেব, সুতরাং তোমরা আমাকে পাঠিয়ে দাও।' সে বলল, 'হে ইউসুফ! হে মহা সত্যবাদী! সাতটি স্থূলকায় গাভী, ওগুলিকে সাতটি শীর্ণকায় গাভী ভক্ষণ করছে এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অপর সাতটি শুষ্ক শীষ সম্বন্ধে আপনি আমাদেরকে ব্যাখ্যা দিন, যাতে আমি লোকদের কাছে ফিরে যেতে পারি এবং যাতে তারা অবগত হতে পারে।' (ইউসুফ) বলল, 'তোমরা সাত বছর একাদিক্রমে চাষ করবে, অতঃপর তোমরা যে শস্য সংগ্রহ করবে তার মধ্যে যে সামান্য পরিমাণ তোমরা ভক্ষণ করবে, তা ব্যতীত সমস্ত শস্য শীষ সমেত রেখে দেবে। এরপর আসবে সাতটি কঠিন (দুর্ভিক্ষের) বছর, এই সাত বছর যা পূর্বে সঞ্চয় ক'রে রাখবে, লোকে তা খাবে; শুধু সামান্য কিছু যা তোমরা সংরক্ষণ করবে তা ব্যতীত এবং এরপর আসবে এক বছর, সেই বছর মানুষের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে এবং সেই বছর মানুষ ফলের রস নিঙড়াবে।' *(ঐ ৪৩-৪৯ আয়াত)*

নূর আলমের মতো যুক্তিবাদীরা স্বীকার করেন, *'আল্লাহর কুদরতির (?) দ্বারা তাদের চোখে ও অন্তরে ভ্রম সৃষ্টি করেছিলেন। যাতে তারা পরস্পর পরস্পরকে কম দেখে......।' (তত্ত্ব...... ৪৮-পৃঃ)*

কিন্তু এ 'কুদরতি' কেবল রসূলদের জন্য স্বীকার করেন। অন্যদের জন্য স্বীকার করেন না। একই আয়াতে কাফেরদের অন্তরেও ঐ 'কুদরতির' প্রভাব স্বীকার করেন না। এটা বড় আজীব যুক্তি। অথচ ইউসুফ নবীর কাহিনীতেও লক্ষ্য করুন, তাঁর কারা সঙ্গীদ্বয় ও বাদশা কোন নবী বা রসূল ছিলেন না। তাহলে কুরআন-ভিত্তিক এই যুক্তিবাদীদের সহীহ হাদীস অস্বীকার করার যুক্তি কি কুযুক্তি এবং আকীদা ও ঈমান-বিধ্বংসী প্রযুক্তি নয়?

পরীক্ষার নতুন ধারা

পাঠক শুনে অবাক হবেন যে, এক বিশেষ পদ্ধতিতে প্রত্যেক মানুষই ডাক্তার-সার্জেন হচ্ছেন।

চাষী-ব্যবসায়ী, কামার-কুমোর সবাই ডাক্তার! এ সহজ পদ্ধতিতে আর বিশেষজ্ঞতার কোন মূল্য নেই, গুরুত্ব নেই। আর তখন বুঝতে পারবেন যে, আসলে তারা সার্জেন হবে, নাকি কসাই?

এবার হতে প্রত্যেক বাঙালীও চোখ বন্ধ ক'রে হাদীস সহীহ, না জাল---তা বুঝতে পারবেন। হাদীস যাচাইয়ের নতুন এই কষ্টিপাথর লাভ ক'রে প্রত্যেকেই এখন থেকে 'মুহাদ্দিস' হয়ে উঠবেন।

আমরা তাঁদের সেই কষ্টিপাথর ও তার যাচাই-শক্তির মান নির্ণয় করব, ইন্ শাআল্লাহ।

নূর আলম সাহেব ৪০পৃষ্ঠায় লিখেছেন,

(১) 'কোরাণের বিপরীত যে কোন বর্ণনাই জাল; তা সনদের দিক দিয়ে যতই মজবুত হোক না কেন।'

এ কষ্টিপাথরটি সাধারণ পাথর। আসলে কোন সহীহ হাদীস কুরআন মাজীদের উক্তির বিপরীত মনে হলে, সেই শ্রেণীর সমন্বয় সাধনের পথ গ্রহণ করতে হবে, যে শ্রেণীর পথ গ্রহণ করতে হয়, কোন একটি আয়াত অপর আয়াতের বিপরীত মনে হলে।

আর এ কথাও জ্ঞাতব্য যে, মু'জিযার হাদীসগুলি কুরআনী বক্তব্যের বিপরীত নয়। যেমন কুরআনে বর্ণিত কয়েকটি মু'জিযা কুরআনের বিপরীত নয়।

(২) 'যে সকল বর্ণনা সত্যের বিপরীত, সে সকল বর্ণনাই জাল; যদিও সনদের দিক দিয়ে সহীহও হয়।

যেমন বুখারীতে বর্ণিত আছে, রসূল সঃ বলেছেন, 'সংক্রামনিক রোগ বলে কোন রোগ নাই।' এটা সম্পূর্ণ জাল। কারণ সারা বিশ্বেই সংক্রামনিক রোগ ব্যাপক। বর্তমানে কোন মূর্খকেও বোঝানো সম্ভব নয় যে, সংক্রামনিক রোগ বলে কিছু নাই। সে উদাহরণ দিবে যে, টিবি, এইড্স, বসন্ত, কলেরা ইত্যাদি। এই সত্যের বিপরীত কথা ওহী হতে পারে না।'

আমরা বলি, চামচিকা যদি সূর্যালোকে দেখতে না পায়, তাহলে তো সূর্যের কোন দোষ হয় না। সংক্রামক ব্যাধি যে আছে, তা নবী ﷺ জানতেন এবং বলতেনও। সংক্রামক ব্যাধি থেকে মুসলিমকে সতর্ক করতেন।

আসলে যুক্তির কাঠগোড়ায় হাদীসের যে অনুবাদ পেশ করা হয়েছে, সে অনুবাদ ঠিক নয়।

পাঠক হাদীস খেয়াল করুন, মহানবী ﷺ বলেছেন,

لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ وَفِرَّ مِنْ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنْ الْأَسَدِ.

অর্থাৎ, রোগের সংক্রমণ ও অশুভ লক্ষণ বলতে কিছুই নেই। পেঁচার ডাকে অশুভ কিছু নেই, সফর মাসেও অশুভ কিছু নেই, আর কুষ্ঠরোগী থেকে সেই রকম পলায়ন কর, যে রকম সিংহ থেকে পলায়ন কর। *(বুখারী ৫৭০৭, মিশকাত ৪৫৭৭নং)*

হাদীসের অর্থ হবে, সংক্রামক ব্যাধি আছে, তা থেকে দূরে থাক, সে রোগকে বাঘের মত ভয় কর। তবে এ কথাও মনে রেখো যে, আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কোন রোগ তোমার শরীরে সংক্রমণ করতে পারে না।

উলামাগণ বলেছেন, নিজস্ব ক্ষমতায় কোন রোগ কারো দেহে সংক্রমণ করে না। কোন রোগী কোন নিরোগ ব্যক্তিকে রোগী বানাতে পারে না। বরং আল্লাহই তাঁর ইচ্ছায় এ সব ক'রে থাকেন। *(আল-ইস্তিযকার ৮/৪২২, আদ্-দীবাজ ৫/২৩৫)*

জাহেলী যুগের লোকেরা ধারণা করত যে, কোন রোগ নিজে নিজেই অন্য দেহে সংক্রমণ করে। নবী ﷺ তাদেরকে জানিয়ে দিলেন যে, ব্যাপারটা তা নয়। আসলে মহান আল্লাহই অসুস্থ করেন এবং তিনিই রোগ অবতীর্ণ করেন। *(তুহফাতুল আহওয়াযী ৬/২৯৫)*

যেমন যদি কেউ ধারণা করে যে, মেঘই বৃষ্টি বর্ষণ করে, তাহলে তাকে বলা হয় যে, মহান আল্লাহই বৃষ্টি বর্ষণ করেন। মেঘ জমলেই বৃষ্টি হওয়া জরুরী নয়, আল্লাহর হুকুমই আসল জিনিস।

এ জন্যই এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, (রোগগ্রস্ত কোন কিছুই অপরকে রোগগ্রস্ত করতে পারে না। তা করলে) "প্রথমটিকে কে সংক্রমিত করল?" যিনি প্রথমে সংক্রামক ব্যাধি সৃষ্টি করেছেন, তিনি ছাড়া অন্য কেউ অন্য দেহে সংক্রমিত করতে পারে না।

জাহেলী যুগের লোকেরা এ ব্যাপারে এত বাড়বাড়ি ধারণা রাখত যে, সংক্রমণের আশঙ্কায় কোন রোগীকে কেউ দেখা করতে যেত না, তার খিদমত করত না এবং এক সাথে বসবাস করত না। সেই বিশ্বাস ভাঙ্গার জন্য ঐ কথা বলা হয়েছে।

হাদীসের অন্য এক অর্থে বলা হয়েছে যে, 'লা আদওয়া' অর্থাৎ, সংক্রমণের মুখে পড়ো না। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন, 'ফালা রাফাসা, অলা ফুসূক্বা অলা জিদালা ফিল হাজ্জ' অর্থাৎ হজ্জে যেন যৌনাচার না করে, পাপাচার না করে এবং ঝগড়া-বিবাদ না করে। অনুরূপ হাদীস 'লা য্বারারা অলা য্বিরার' অর্থাৎ ক্ষতি করো না এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়ো না। 'লা স্বালাতা বা'দাল আস্র......' অর্থাৎ আসরের পর (নফল) নামায পড়ো না ইত্যাদি। আর উক্ত হাদীসের শেষাংশটি এ কথারই ইঙ্গিত বহন করে।

যুক্তিবাদীর উল্লিখিত অনুবাদ অনুযায়ী যদি হাদীসের উদ্দেশ্য হত, তাহলে সত্যই তাতে সন্দেহ ছিল। বুঝা গেল, বুখারীর হাদীস জাল নয়, জাল হল ঐ যুক্তিবাদীর ভুয়ো যুক্তি।

উক্ত হাদীসের মর্ম নিয়ে একটি হাদীস দেখুন। ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, একদা উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ সিরিয়ার দিকে যাত্রা করলেন। অতঃপর যখন তিনি 'সার্গ' (সঊদিয়া ও সিরিয়ার সীমান্ত) এলাকায় গেলেন, তখন তাঁর সাথে সৈন্যবাহিনীর প্রধানগণ---আবূ উবাইদাহ ইবনুল জার্রাহ ও তাঁর সাথীগণ---সাক্ষাৎ করেন। তাঁরা তাঁকে জানান যে, সিরিয়া এলাকায় (প্লেগ) মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, তখন উমার আমাকে বললেন, আমার কাছে প্রাথমিক পর্যায়ে যাঁরা হিজরত করেছিলেন সেই মুহাজিরদেরকে ডেকে আনো। আমি তাঁদেরকে ডেকে আনলাম। উমার ﷺ তাঁদেরকে সিরিয়ায় প্রাদুর্ভূত মহামারীর কথা জানিয়ে তাঁদের কাছে সুপরামর্শ চাইলেন। তখন তাঁদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হল। কেউ বললেন, আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে বের হয়েছেন। তাই তা থেকে ফিরে যাওয়াকে আমরা পছন্দ করি না। আবার কেউ কেউ বললেন, আপনার সাথে রয়েছেন অবশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও নবী ﷺ-এর সাহাবীগণ। কাজেই আমাদের কাছে ভাল মনে হয় না যে, আপনি তাঁদেরকে এই মহামারীর মধ্যে ঠেলে দেবেন। উমার ﷺ বললেন, তোমরা আমার নিকট থেকে উঠে যাও। তারপর তিনি বললেন, আমার নিকট আনসারদেরকে ডেকে আনো। সুতরাং আমি তাঁদেরকে ডেকে আনলাম এবং তিনি তাঁদের কাছে পরামর্শ চাইলেন। কিন্তু তাঁরাও মুহাজিরদের পথ অবলম্বন করলেন এবং তাঁদের মতই তাঁরাও মতভেদ করলেন। সুতরাং উমার ﷺ বললেন, তোমরা আমার নিকট থেকে উঠে যাও। তারপর আমাকে বললেন, এখানে যে সকল বয়োজ্যেষ্ঠ কুরাইশী আছেন, যাঁরা মক্কা বিজয়ের বছর হিজরত করেছিলেন তাঁদেরকে ডেকে আনো। আমি তাঁদেরকে ডেকে আনলাম। তখন তাঁরা পরস্পরে কোন মতবিরোধ করলেন না। তাঁরা বললেন, আমাদের রায় হল, আপনি লোকজনকে নিয়ে ফিরে যান এবং তাদেরকে এই মহামারীর কবলে ঠেলে দেবেন না। তখন উমার ﷺ লোকজনের মধ্যে ঘোষণা দিলেন যে, আমি ভোরে সওয়ারীর পিঠে (ফিরে যাওয়ার জন্য) আরোহণ করব। অতএব তোমরাও তাই কর। আবু উবাইদাহ ইবনুল জার্রাহ ﷺ বললেন, আপনি কি আল্লাহর নির্ধারিত তকদীর থেকে পলায়ন করার জন্য ফিরে যাচ্ছেন?

উমার ﷺ বললেন, হে আবূ উবাইদাহ! যদি তুমি ছাড়া অন্য কেউ কথাটি বলত। আসলে উমার তাঁর বিরোধিতা করতে অপছন্দ করতেন। বললেন, হ্যাঁ। আমরা আল্লাহর তকদীর থেকে আল্লাহর তকদীরের দিকেই ফিরে যাচ্ছি। তুমি বল তো, তুমি কিছু উটকে যদি এমন কোন উপত্যকায় দিয়ে এস, যেখানে আছে দু'টি প্রান্ত। তার মধ্যে একটি হল সবুজ-শ্যামল, আর অন্যটি হল বৃক্ষহীন। এবার ব্যাপারটি কি এমন নয় যে, যদি তুমি সবুজ প্রান্তে চরাও, তাহলে তা আল্লাহর তকদীর অনুযায়ীই চরাবে। আর যদি তুমি বৃক্ষহীন প্রান্তে চরাও তাহলেও তা আল্লাহর তকদীর অনুযায়ীই চরাবে? বর্ণনাকারী (ইবনে আব্বাস ﷺ) বলেন, এমন সময় আব্দুর রহমান ইবনে আউফ ﷺ এলেন। তিনি এতক্ষণ যাবৎ তাঁর কোন প্রয়োজনে অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, এ ব্যাপারে আমার নিকট একটি তথ্য আছে, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "তোমরা যখন কোন এলাকায় (প্লেগের) প্রাদুর্ভাবের কথা শুনবে, তখন সেখানে যেও না। আর যদি এলাকায় প্লেগের প্রাদুর্ভাব নেমে আসে আর তোমরা সেখানে থাক, তাহলে পলায়ন করে সেখান থেকে বেরিয়ে যেও না।" সুতরাং (এ হাদীস শুনে) উমার ﷺ আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং (মদীনা) ফিরে গেলেন। (বুখারী, মুসলিম)

আমি আমার তওহীদে লিখেছি, "মুসলিম কোন রোগ-ব্যাধির নিজস্ব সংক্রমণে বিশ্বাসী নয়। কারণ, আল্লাহর তরফ থেকেই (প্রথম) আক্রমণ এবং (পরে) সংক্রমণ হয়ে থাকে। *(বুঃ ৫৭০৭, মুঃ ২২২০)* আবার সংক্রামক ব্যাধি থেকে সাবধানও থাকে। কারণ, সে তকদীর ও তদবীর দুয়েই বিশ্বাসী। তাই যে স্থানে কলেরা, বসন্ত বা অন্য কোন মহামারী দেখা দেয়, সে স্থানে সে বর্তমান থাকলে সেখান হতে ভয়ে বের হয়ে পলায়ন করে না। কারণ তকদীর হতে পালাবার পথ কোথায়? কিন্তু সে স্থানের বাইরে থাকলে সেখানে প্রবেশ করে না। কারণ, তদবীরও ফল দেয়। *(বুঃ ৫৭২৯, মুঃ ২২১৯, মুঃ আঃ ১/১৯২)*

তদনুরূপই কোন সংক্রামী ব্যাধিগ্রস্ত মানুষের কাছে থাকলে দূরে সরে যায় না। বা তাকে দূর বাসে না এবং দূরে থাকলে কাছে আসেনা (মুমূর্ষের সাহায্য ও চিকিৎসা করার কথা স্বতন্ত্র)। কারণ, মানুষের কাজ তদবীর করা বা সাবধানতা অবলম্বন করা। তকদীর তার নিজের কাজ করবে। *(বুঃ ৫৭০৭, মুঃ ২২৩১)*

আবার তার কাছে যাওয়ার পর যদি তারও সেই ব্যাধি হয়ে যায়, তবে সে এ বিশ্বাস বা ধারণা করে না যে, তার কাছে এসেই রোগটা হল। বরং বিশ্বাস রাখে যে, এটা তার নিয়তির গতি বা আল্লাহপাকের ইচ্ছা।"

রোগের নিজস্ব সংক্রমণ নেই। আল্লাহর ইচ্ছা না হলে কোন রোগ সংক্রমণ করতে পারে না। এ কথা মূর্খরাও জানে যে, একই বাড়িতে কিছু লোকের সংক্রামক রোগ হলে অনেক লোকের তা হয় না। রোগ ছোঁয়াচে হলেই যে প্রত্যেককেই আক্রমণ করবে---তা জরুরী নয়। রোগের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ যেমন ছোঁয়াচে রোগ প্রথম ব্যক্তিকে আক্রমণ করার ক্ষমতা দেখান, তেমনি তা প্রসার লাভ করার পরেও অনেক লোককে সংক্রমণ থেকে রক্ষা করার ক্ষমতা রাখেন। এটাই হল আকীদা।

বাকী থাকল, সাবধানতা অবলম্বন করার কথাও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। ছোঁয়াচে রোগীর সংস্পর্শে আসতে নিষেধ করা হয়েছে। মহামারীগ্রস্ত দেশ বা শহরে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু যে রোগীর সংস্পর্শে আছে, সে কী করবে? তার মনকে শক্ত করার জন্য কি এই আকীদা জরুরী নয় যে, রোগের নিজস্ব সংক্রমণ নেই?

বলা বাহুল্য, *'সংক্রামনিক বলে কোন রোগ নাই'* এ কথা ভুল। এটি হাদীসও নয়। নতুবা

অনুবাদে ভুল। আর সেই ভুলে পড়েন তাঁরা, যাঁদের ওস্তাদ হয় 'কিতাব' সাহেব।

ঐ শ্রেণীর হাদীস যেমন অহী হতে পারে না, তেমনি হাদীস না বুঝে যে হৈচৈ করে, তার জ্ঞান সঠিক হতে পারে না। সুতরাং সে জ্ঞান কি অহী যাচাইয়ের কষ্টিপাথর হতে পারে?

পক্ষান্তরে *'সূর্যের তাপে তপ্ত পানিতে স্নান করিলে কুষ্ঠ রোগ হয়' (তত্ত্ব...... ৪১পৃঃ)*---এ হাদীসটি জাল ও গড়া হাদীস। হাদীসটির বক্তব্য বাস্তব-বিরোধী বলে নয়, বরং তার সনদেই জালিয়াতির কথা ধরা পড়েছে। এই জন্য হাদীসটির স্থান হয়েছে প্রায় সমস্ত 'মাওযূআত' গ্রন্থে। অথচ যুক্তিবাদীরা বুখারীকে ছোট করার জন্য উল্লেখ করেছেন, *'বুখারীতে বর্ণিত আছে!'* এটি অবশ্যই অজ্ঞানতা অথবা উদ্দেশ্য প্রণোদিত। কারণ এ হাদীস বুখারীতে নেই। ফাল্লাহুল মুস্তাআন। পাঠক বুঝতেই পারছেন, কাস্তে-কুড়ুল নিয়ে অপারেশন করার কুফল।

৩। 'শব্দ ও ভাষার অসঙ্গতিপূর্ণ বর্ণনাও জাল।' এর উদাহরণে যে হাদীস পেশ করা হয়েছে সেটি পূর্বোক্ত হাদীস চেনার পদ্ধতির উদাহরণ। অর্থাৎ বাস্তব-বিরোধী প্রত্যেক হাদীসই জাল। হাদীসটি হল, "সকল প্রাণীর ছবিতোলা বা আঁকা হারাম। তবে গাছ-গাছারীর ছবিতোলা বা আঁকা জায়েয।" *এই বর্ণনায় (নাকি) রসুল সঃকে সীমিত জ্ঞানের মানুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছে। কারণ রসুল সঃ জানতেন না যে, গাছ গাছারীরও প্রাণ আছে। (তত্ত্ব...... ৪১পৃঃ)*

প্রিয় পাঠক হাদীসে কী আছে, তা প্রণিধান করুন ঃ-

(إِنْ كُنْتَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً فَاصْنَعِ الشَّجَرَ وَمَا لاَ نَفْسَ لَهُ)

'যদি করতেই হয়, তাহলে গাছ এবং সেই জিনিসের মূর্তি বা ছবি বানাও, যার প্রাণ নেই।' এখানে গাছের প্রাণ না থাকার কথা তো প্রমাণ হয় না। হাদীসের উদ্দেশ্য হল, তুমি গাছের ছবি বানাতে পার। আর সেই সকল জড়পদার্থেরও ছবি বানাতে পার, যাতে প্রাণ নেই।

দ্বিতীয়তঃ যদি উক্ত হাদীস থেকে এ কথা বুঝাও যায় যে, গাছের প্রাণ নেই, তাহলে হাদীসে বর্ণিত 'রূহ' বা 'নাফ্স' বলতে উদ্দেশ্য হল, বিচরণশীল প্রাণীর প্রাণ। অর্থাৎ, যে প্রাণী চলেফিরে বেড়ায়, তাকে 'রূহ' বা 'নাফ্স'-ওয়ালা প্রাণী বলা হয়। পক্ষান্তরে গাছের মধ্যে 'হায়াত' বা 'জীবন' থাকলেও, তাকে আরবীতে 'যাতুর রূহ' বা 'যাতুন নাফ্স' বলা হয় না। এ কথা কেবল বিচরণশীল প্রাণীর জন্যই ব্যবহার হয়।

তৃতীয়তঃ এ উক্তি নবী ﷺ-এর নয়। বরং এ হল ইবনে আব্বাস ﷺ-এর উক্তি।

সুতরাং যুক্তিবাদীর যুক্তির জাল যে আসলে মাকড়সার জাল, তাতে কি সন্দেহ আছে?

ওঁরা বলেন, *'হাদীসটি জাল হওয়ার আরো একটি প্রমাণ, মহান আল্লাহ বলেন, "আমি এমন বোঝা চাপাইনি যা মানব জাতি বহন করতে পারবে না।" অথচ বাস্তবে দেখা যায় পৃথিবীতে এমন কোন সাবালক ও সাবালিকা (?) নেই যে, সে ছবি ছাড়া চলতে পারে। অতএব ছবি তোলার বর্ণনাটি কল্পনার।' (তত্ত্ব...... ৪১পৃঃ)*

হ্যাঁ, এই জন্যই তো কুরআনের পর্দার আয়াতকে পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ মানতে চায় না। হয়তো বা সে বর্ণনাটিও কল্পনার। কারণ, শরয়ী পর্দা মানা বড় কঠিন। ইত্যাদি।

অথচ মুফতী সাহেবগণ এই আয়াত প্রয়োগ করেন কোন হারাম জিনিসকে বাধ্য হয়ে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে। অর্থাৎ, ছবিতোলা হারাম; কিন্তু নিরুপায়ের ক্ষেত্রে জায়েয। সূদী ঋণ নেওয়া হারাম; কিন্তু নিরুপায়ের ক্ষেত্রে জায়েয। পর্দা করা ওয়াজেব; কিন্তু নিরুপায়ের ক্ষেত্রে বেপর্দা হওয়া এমনকি নগ্ন হওয়াও জায়েয। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন, "আমি এমন বোঝা চাপাইনি যা মানব জাতি বহন করতে পারবে না।" তাহলে কোন কাজ বাধ্য হয়ে করতে হলে, সে কাজ নিষেধ হওয়ার হাদীসকে চোখ বুজে চাঁদ দেখার মত 'কল্পনার' বলা কি 'মাতুরীদী'মার্কা

স্বেচ্ছাচারিতা নয়?

পরিশেষে যুব সমাজের প্রতি আমাদের আন্তরিক আবেদন, তাঁরা যেন 'বাক্-স্বাধীনতা, নারী-স্বাধীনতা বা যৌন-স্বাধীনতা, চিন্তা-স্বাধীনতা' প্রভৃতির মনোলোভা লেবেলের ধোঁকায় পড়ে স্বেচ্ছাচারিতার ফাঁদে পা না দেন। কারণ যে গাড়ির চালক নিজের খেয়াল-খুশী মুতাবিক গাড়ি চালায়, তার ধ্বংস অনিবার্য।

আর বুদ্ধিমানের কাজ করুন, দা গড়তে ভাল কামারের কাছে যান, হাঁড়ি গড়তে ভাল কুমোরের কাছে যান, অলংকার গড়তে ভাল স্বর্ণকারের কাছে যান, সাইকেল সারতে সাইকেল-মিস্ত্রির কাছে যান, গাড়ি সারতে ম্যাকানিকের কাছে যান, চিকিৎসা করতে ভাল ডাক্তারের কাছে যান, আর দ্বীন ও ঈমান বাঁচাতে ভাল আলেমের সাহচর্য গ্রহণ করুন। হাতুড়ে ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা করিয়ে নিজের জীবন নষ্ট করবেন না এবং 'মুতাআলেম'-এর ফায়সালা নিয়ে নিজের ঈমান বরবাদ করবেন না। অহংকার থেকে দূরে থাকুন, আলেম সম্প্রদায়কে আমভাবে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবেন না। ইসলামী সংস্কারের কথা না বুঝে কুসংস্কার মনে করে প্রচার করবেন না। করলে অবশ্য অমুসলিমদের কাছে প্রশংসা পাবেন, পশ্চিম থেকে আপনার ভিসা আসবে, পুরস্কৃত হবেন, ধর্মনিরপেক্ষ পত্র-পত্রিকায় আপনার নাম চড়বে ঠিকই, কিন্তু আল্লাহর কাছে এবং প্রকৃত মুসলিমদের কাছে আপনি হবেন তিরস্কৃত, ঘৃণ্য, নিন্দিত ও লাঞ্ছিত।

আল্লাহ আমাদেরকে দ্বীন বাঁচানোর তওফীক দিন। আমীন।

পরীক্ষার নতুন ধারায় ইফতারীর দুআ

বড় দুঃখ ও বড় বিপদের কথা তখন হয়, যখন শুনি যে, নাড়ীটেপা ডাক্তার অথবা কোন প্লাম্বার (সীসক কর্মকার) রোগীর অপারেশন করছে! সে ক্ষেত্রে যেমন রোগীর জীবনের ভরসা থাকে না, তেমনি আলেমদের নৌকার হাল যদি অনালেমরা ধরতে চায়, তাহলে ইসলামের যে কী দশা হতে পারে তা অনুমেয়।

আমার ভাবতে বড় অবাক লাগে, তাঁরা এই শ্রেণীর দুঃসাহসিকতা কেন করেন? যাঁদের সহীহ-যয়ীফের বিচারবোধ নেই, ইসলামী মৌলনীতির জ্ঞান নেই, আরবী ভাষাজ্ঞান নেই, তাঁরা আলেমদের টেক্কা দিতে চান কোন্ সাহসে? কোন্ মানসে?

আবার মুখে মুখে হয়, তাও আচ্ছা। কিন্তু যুক্তিবাদী সেজে এইভাবে টাকা-পয়সা খরচ ক'রে বই প্রকাশ ক'রে নিজেদেরকে সমাজের কাছে হাসির পাত্র করেন কেন? *(যদিও সম্ভাব্য যে, এর পিছনে ঐ শ্রেণীর কোন আলেম লুকিয়ে আছেন।)*

সহীহ হাদীসে আছে, আল্লাহর নবী ﷺ যখন ইফতার করতেন, তখন বলতেন,

(ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ).

উচ্চারণঃ- যাহাবায যামা-উ অবতাল্লাতিল উরুকু অসাবাতাল আজরু ইন্ শা-আল্লাহ।

অর্থ- পিপাসা দূরীভূত হল, শিরা-উপশিরা সতেজ হল এবং আল্লাহ চান (বা চেয়েছেন) তো সওয়াব সাব্যস্ত হল। *(আবু দাউদ ২৩৫৭, নাসাঈ কুবরা , ইবনুস সুন্নী ৪৭২,দারাকুত্বনী ২৪০নং, হাকেম ১/৪২২, বাইহাক্বী ৪/২৩৯, মিশকাত ১৯৯৩, ইরওয়াউল গালীল ৯২০, সহীহুল জামে' ৪৬৭৮নং)*

সুতরাং ইফতারীর পরে এ কথা বলা সুন্নত। কিন্তু যুক্তিবাদীদের দাবী হল, এটি হাদীস নয়। কারণ ঃ-

১। 'এটি দুআ নয়। কেননা দুআ অর্থ চাওয়া। আর এতে চাওয়া বা প্রার্থনার কোন কথা নেই।' (তত্ত্ব......৫০পৃঃ)

আমরাও বলছি, এটি সেই অর্থে দুআ নয়, যে অর্থে যুক্তিবাদীরা মনে করেছেন। তাছাড়া হাদীসে 'এই দুআ করতেন' শব্দ নেই; বরং 'বলতেন' শব্দ আছে।

তবুও তাকে দুআ বলা হল কেন? দুআর আসল মানে ডাকা, আর তা হচ্ছে দুই প্রকার ঃ দুআউল মাসআলাহ ও দুআউয্ যিক্র।

প্রথম প্রকার দুআতে ডাকা, আহবান করা, প্রার্থনা করার অর্থ থাকে। এই দুআর সাথে ভিখিরীর গৃহস্থের কাছে ভিক্ষা চাওয়ার মিল রয়েছে।

আর দ্বিতীয় প্রকার দুআতে 'যিক্র' (স্মরণ) থাকে, সরাসরি প্রার্থনা থাকে না। যেমন ভিখিরী গৃহস্থের কাছে গিয়ে নিজের হাল বলে এবং গৃহস্থ তা বুঝে তাকে দান করে। লক্ষ্য করুন ইউনুসের দুআ,

{لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ} (٨٧) سورة الأنبياء

অর্থাৎ, তুমি ছাড়া কোন (সত্য) উপাস্য নেই; তুমি পবিত্র, মহান। নিশ্চয় আমি সীমালংঘনকারী। *(সূরা আম্বিয়া ৮৭ আয়াত)*

এ দুআতে প্রার্থনা নেই, তবুও তা দুআ ও প্রার্থনা। যেহেতু এ হল দুআয়ে যিক্র।

অনুরূপ মহানবী ﷺ বলেন,

(خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي : لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ).

অর্থাৎ, "শ্রেষ্ঠ দুআ আরাফার দিনের দুআ; আমি ও আমার পূর্বের নবীগণ যা বলেছেন তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কথা,

'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহ, লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহুওয়া আলা কুল্লি শাইইন ক্বাদীর।' (আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁরই সারা রাজত্ব এবং তাঁরই সকল প্রশংসা। আর তিনি সর্ব বস্তুর উপর সর্বশক্তিমান।)" *(তিরমিযী ৩৫৮৫নং)*

দেখুন, এই দুআ শ্রেষ্ঠ দুআ হওয়া সত্ত্বেও তাতে কোন প্রার্থনা নেই। কিন্তু যুক্তিবাদীরা হয়তো এটিকেও ফুঁক দিয়ে উড়িয়ে দেবেন।

বলা বাহুল্য, উক্ত ইফতারীর দুআতে প্রার্থনার অর্থ না থাকলেও যিক্রের অর্থ রয়েছে। অতএব তা অন্তঃসারশূন্য নয়। মহানবী ﷺ-এর বাণী কি অন্তঃসারশূন্য হতে পারে? অন্তঃসারশূন্য হল বেআদব যুক্তিবাদীদের ভুয়ো যুক্তি। তাঁদেরই হৃদয় মহানবী ﷺ-এর বাণীর প্রতি শ্রদ্ধা থেকে শূন্য।

২। দুআটি ইসলামের মূল নীতিবিরুদ্ধ। (তত্ত্ব......৫০পৃঃ)

এটি সত্যিকারে ইসলামের মূল নীতিবিরুদ্ধ কি না, সে কথা তাঁরাই বলতে পারেন, যাঁরা ইসলামের মূল নীতি জানেন ও বোঝেন, আরবী ভাষা বোঝেন। নচেৎ 'কালা বলে গায় ভাল, কানা বলে নাচে ভাল' অবস্থা হলে কে আর মেনে নেবে?

মূলতঃ ইসলামী বিচারবোধ যদি কারো না থাকে, তাহলে সে ইসলাম সম্বন্ধে মুখ খুলতে এবং সহীহ হাদীসের উপরে ক্ষুর চালাতে যায় কেন? বিশ্বের পার্থিব বিষয়ের বিচারবোধ দিয়ে কি ইসলামী কোন বিষয়ের বিচার করা যায়? ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে কি অপারেশন করা যায়? ডাক্তারি পড়ে কি উকালতি করা যায়?

'আমরা আলেমদের নিকট হতে যতটা জানতে পেরেছি তাতে দোয়া অর্থে চাওয়া। যদিও সব চাওয়া দোয়া নয়।' (তত্ত্ব...... ৪৯পৃঃ) তাহলে আলেমদের নিকট হতে এ কথাও জেনে অথবা মেনে নিলেন না কেন যে, সব দুআর অর্থ চাওয়া নয়।

কোথায় পেলেন যে, প্রত্যেক কর্মের শেষে 'আল-হামদু লিল্লাহ' বলে দুআ করতে হয়। (যদিও যুক্তিবাদীর মতে 'আল-হামদু' দুআ নয়।) যে কোন কর্মের পূর্বে 'ইন্ শাআল্লাহ' বলতে হয় এবং পরে বলা যায় না, *(তত্ত্ব.....৫০পৃঃ দ্রঃ)* কেবল এ নীতিই শিখেই অন্য সকল নীতির খণ্ডন করা যায়?

আসলে আধা-শিক্ষিত লোকেদের অবস্থা এটাই। একবার একজনকে বলা হল, 'যোহরের পরে চার রাকআত সুন্নত আছে।' সে বলে উঠল, 'আজীবন দু'রাকআত পড়ে এলাম, শুনে এলাম, আজ আবার চার এল কোত্থেকে?' কোন মতেই সে মানল না।

অনুরূপ মানুষ একটি বিষয় জেনে নিয়ে, সেই বিষয়েই অন্য কোন পদ্ধতি, তরীকা, নীতিকে কোন মতেই মানতে রাযী হয় না। অথচ এ সকল অজানা ক্ষেত্রে মেনে নিতে না পারলেও মানুষের চুপ থাকা ভাল। তাতে অন্ততঃপক্ষে মান-ইজ্জত রক্ষা পায়। পক্ষান্তরে না জেনে জাননে-ওয়ালা লোকদের সাথে তর্ক করলে, বোকামির পরিচয় দেওয়া হয়।

'ইন্ শাআল্লাহ' তিন অর্থে ব্যবহার হয় ঃ-

(ক) তাকীদের অর্থে। 'ইন্ শাআল্লাহ আমি যাব।'

(খ) আল্লাহর ইচ্ছার উপর লটকে দেওয়ার অর্থে। অর্থাৎ, 'আল্লাহ চাইলে আমি যাব।' অর্থাৎ, যেতে না পারলে আমার দোষ হবে না।

(গ) তাযকিয়াতুন নাফ্স (আত্মশ্লাঘা) থেকে বাঁচার অর্থে।

যেমন যদি কেউ আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, 'আপনি কি মুত্তাকী?' তাহলে আপনি বলবেন, 'ইন্ শাআল্লাহ আমি মুত্তাকী।' কারণ, তা না বললে আপনার আত্মশ্লাঘা হবে। অথচ হয়তো বা আপনি আল্লাহর কাছে 'মুত্তাকী' নন। আর সেই জন্য আল্লাহর ইচ্ছায় লটকে দেওয়া হয়।

যেমন আপনি পরীক্ষা দিয়ে এলেন। পরীক্ষা কেমন হয়েছে তা নিশ্চিত নয়। কেউ আপনাকে জিজ্ঞাসা করল, 'পরীক্ষা কেমন হয়েছে?' তখন আপনি বলতে পারেন, 'ইন্ শাআল্লাহ ভাল হয়েছে।' কারণ, এখনো আপনার ফলাফল অজানা। আর তার জন্যই তা আল্লাহর ইচ্ছার উপরে লটকে দেবেন।

যেমন আমি চিঠি পাঠালাম। মা ফোনে বললেন, 'চিঠি পৌঁছেনি।' আমি বললাম, 'আজ গুসকরায় পৌঁছে গেছে ইন্ শাআল্লাহ।' কেননা গুসকরায় চিঠি পৌঁছেছে কি না আমি নিশ্চিত নই। তা অতীতের খবর হলেও সন্দেহের কারণে আল্লাহর ইচ্ছার উপর লটকে দিলাম।

বলা বাহুল্য, উক্ত দুআয় 'ইন্ শাআল্লাহ' বলা ভুল নয়। আর ভুল হবে কেন? এ যে আরবের সবচেয়ে বড় ভাষাবিদের উক্তি!

'সওয়াব সাব্যস্ত হল'---এ কথা নিশ্চয়তার সাথে বলা যায় না বলেই 'ইন্ শাআল্লাহ' বলে আল্লাহর ইচ্ছাধীন করা হয়েছে। এতে রয়েছে আল্লাহর সাথে বড় আদব। যেহেতু আমলের প্রতিদান দেওয়া আল্লাহর উপর ওয়াজেব নয়। 'রোযা রাখলাম ইন্ শাআল্লাহ নয়। রোযার সওয়াব পেলাম ইন্ শাআল্লাহ।'

বলা বাহুল্য, উক্ত ইফতারীর দুআতে 'ইন্ শাআল্লাহ' ইসলামী মূল-নীতির বিপরীত নয়। এই শ্রেণীর আরো একটি দুআ, রোগী দেখার দুআ ঃ 'লা বা'সা ত্বাহূরুন ইন্ শাআল্লাহ।'

৩। 'দুআটির আদ্যোপান্ত কোথাও আল্লাহর প্রশংসাসূচক শব্দ ব্যবহার হয়নি।.....কার নিকট বর্ণনা করা হচ্ছে, তার কোন লক্ষ্যস্থল নেই।' (তত্ত্ব......৫০পৃঃ)

গভীর ভাবনা নিয়ে ভেবে দেখলে এবং সূক্ষ্মভাবে এর বিশ্লেষণ করলে আপনিও বুঝতে পারবেন, দুআটির আদ্যন্ত গোটাটাই প্রশংসা। দুআটির কোন লক্ষ্যস্থল উল্লেখ নেই। কিন্তু দুআ

তো আল্লাহর জন্যই হয়, আল্লাহর যিক্‌রের জন্য, তাঁর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আদায়ের জন্য, তাঁর কাছে কিছু পাওয়ার জন্য। দুআ তো কেবল মুখে বলে বাতাসে ছেড়ে আকাশে উড়িয়ে দেওয়া হয় না। আর এতে প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা রয়েছে এই বলে যে, 'পিপাসা দূরীভূত হল, শিরা-উপশিরা তরতাজা হল।' কারণ আল্লাহই তো এ সব করেন।

সারাদিন অনাহারে থেকে আল্লাহর স্মরণ হয়েছে। তাঁরই অনুমতিক্রমে এখন পানাহার করলাম। তাই তো খুশীতে বললাম, 'শিরা-উপশিরা সতেজ হল।' যা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই উপবাসে থেকে শুষ্কপ্রায় হয়ে গিয়েছিল। আর সেই সাথে এ কাজের 'প্রতিদানও পেলাম।' এ কথা কি প্রশংসা নয়? এই অভিব্যক্তি কি কৃতজ্ঞতা নয়? এটা কি আল্লাহর যিক্‌র নয়?

পরন্তু সবশেষে আল্লাহর সর্বোপরি ইচ্ছার কথাও স্বীকার হয়েছে। কারণ পরীক্ষা তো দিয়েছি, কিন্তু তা কেমন হয়েছে জানি না। তবে আশা করি ভাল হয়েছে। রোযা তো রাখলাম, কিন্তু তা কেমন হয়েছে জানি না। তবে আশা করি ভাল হয়েছে, মহান আল্লাহ তা কবুল ক'রে নিয়েছেন এবং তাঁর ইচ্ছা হলে তার সওয়াব দান করেছেন। এতে কি প্রশংসার সৌরভ আসে না? এতে কি আল্লাহর কাছে বিনয় প্রকাশ হয় না?

৪। 'ওটি দুআ নয়, ওটি একটি শরীর-ভিত্তিক কবিতা!' (তত্ত্ব......৫১পৃঃ)

ছন্দের মিল না থাকলেও অমিত্রাক্ষর কবিতা!

নূর আলম সাহেব বলেন, *'এতবড় একটা ভুল পনেরোটা মাদ্রাসার তাবড় তাবড় আলেমগণ বুঝে উঠতে পারলেন না!' (তত্ত্ব......৫১পৃঃ)*

আরে দূর! ভুল কথা। সারা বাংলার কোন আলেম বুঝতে পারলেন না। আসলে তাঁরা বুঝবেন কী ক'রে? তাঁরা তো আর বাংলা জানেন না। তাঁরা তো আরবী-উর্দু পড়েছেন, কিন্তু বাংলাতে মূর্খ। আর বাংলাতে মূর্খ হলে আরবী কোন বাক্য গদ্য, না পদ্য অথবা অন্য কিছু---তা কিভাবে ধরতে পারবেন?

আরবী মহাকবি কুরআনকে 'আল্লাহর কালাম' বলে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কারণ তিনি ছিলেন জওহরী, জওহর তো চিনবেনই। মনে হয় কোন বাঙ্গালী মহাকবি হলে আরো ভালোরূপে চিনতে পারতেন।

মহানবী ﷺ-এর আরবী দুআ কোন আরবী পন্ডিতে বলতে পারলেন না, সেটা আদৌ দুআ নয়, কবিতা। সারা বিশ্বের আরব-আজমের কোন আলেমে বলতে পারলেন না, সেটা দুআ নয়, কবিতা মাত্র। মুহাদ্দিসীনগণ বলতে পারলেন না, সেটা দুআ নয়, কবিতাছত্র। শারেহীনে হাদীসগণ ধরতে পারলেন না, সেটা দুআ নয়, কবিতা। আর বাংলার একজন যুক্তিবাদী হাদীস-গবেষক সুগভীর ভাবনা ও বিশ্লেষণের কষ্টিপাথরে যাচাই ক'রে বলে দিলেন, *'ওটা একটি শরীর-ভিত্তিক কবিতা!' 'সোনা ও পিতলের পার্থক্য করে কষ্টিপাথর। আর ইসলামী শরীয়তের কষ্টিপাথর হল তাঁর গভীর ভাবনা ও বিশ্লেষণ!' (তত্ত্ব......৫১পৃঃ)*

সত্যপক্ষে তিনি পুরস্কারের যোগ্য। বরং তিনি নবী হওয়ার যোগ্য।

فإنا لله وإنا إليه راجعون.

অনুবাদ-ভিত্তিক বিভ্রান্তির কতিপয় নমুনা

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ঃ আল্লাহ ছাড়া কোন হুকুমকর্তা বিধান দাতা নেই। আল্লাহ ছাড়া কেউ নেই। আল্লাহ ছাড়া সৃষ্টিকর্তা নেই।

লা ইসলামা ইল্লা বিল-জামাআহ ঃ দল ছাড়া ইসলাম নেই।

মান খারাজা মিনাল জামাআতি...... ঃ যে ব্যক্তি জামাআত (ইসলামী) থেকে বের হয়ে যাবে, সে ইসলামের রশিকে গলা থেকে খুলে ফেলবে।

খাদেমুল হারামাইন মালেক আব্দুল্লাহ ঃ মক্কা-মদীনার দুই মসজিদের রক্ষাকর্তা বাদশা আব্দুল্লাহ। *(আনন্দবাজার পত্রিকা ২/৩/১০)*

লা তাক্বরাবা হাযিহিশ শাজারাহ ঃ এই গাছের নিকট যেও না, অর্থাৎ হে আদম! তুমি হাওয়ার কাছে যেও না। এখানে 'বৃক্ষ' আদি মাতা বিবি 'হাওয়া'। *(কোরআন শরীফ, ডঃ ওসমান গনী ১২৭পৃঃ)*

অথচ আরবী ভাষা যাঁরা জানেন, তাঁরা বুঝতে পারবেন যে, 'এ গাছটির নিকটবর্তী হয়ো না' কেবল আদমকেই বলা হয়নি; বরং 'লা তাক্বরাবা' দ্বিবচনের শব্দ দিয়ে আদম-হাওয়া উভয়কেই বলা হয়েছিল। সুতরাং এটা কি অনুবাদের বিভ্রান্তি নয়?

মোহাজের অর্থ হাজিরান বা উপস্থিত ব্যক্তি। যাঁরা মহানবীর হিযরত কালে মদীনায় তাঁর নিকট হাজির হয়ে তথায় বসবাস স্থাপন করেছিলেন। *(কোরআন শরীফ, ডঃ ওসমান গনী ১৪৯পৃঃ)*

পাঠক! বুঝতেই পারছেন, محاضر আর مهـــاجر এক নয়। আর এ কথাও বুঝতে পারছেন যে, আরবী কিন্তু সহজ জিনিস নয়।

অবিল-আখেরাতি হুম ইউকিনূন ঃ তারা শেষ নবীর উপরেও একীন রাখে। (মুহাম্মাদ ﷺ শেষ নবী নন।)

ভুল বুঝা অনুবাদের কাস্তে দ্বারা আরো ফসল দেখুন ঃ-

ইসলামে সকলের অধিকার সমান।

নর-নারীর সমান অধিকার আছে ইসলামে।

ইসলামে সাম্যবাদ (কমিউনিজম) আছে।

আল্লাহ সব জায়গায় আছেন। আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান। আল্লাহ সর্বময়। *(কোরআন শরীফ, ডঃ ওসমান গনী ৩৪পৃঃ)*

আল্লাহ মানব অন্তরে থাকেন। *(ঐ ৪২পৃঃ)*

আল্লাহ কুদরতের আসনে আসীন আছেন। *(তফসীর ঃ আকরাম খাঁ)*

আরশ ঃ সিংহাসন---আকাশ ও পৃথিবী জুড়ে অবস্থিত, যা বিশ্বাসীদের অন্তরে অবস্থিত। *(কোরআন শরীফ, ডঃ ওসমান গনী ১১৫পৃঃ)*

আল্লাহর কুদরতী হাতে আদমকে সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহ নিরাকার। *(কোরআন শরীফ, ডঃ ওসমান গনী ঃ মুখবন্ধ ৭৭পৃঃ)*

আল্লাহ দিক-বর্জিত, অসীম, তিনি সীমা-পরিধির উর্ধ্বে।

জিহাদের নামে সন্ত্রাস।

আরো অনেক কিছু।

বই লেখার শখ যাঁদের

পরিশেষে বলি, লেখার যদি কারো নেশা হয়, অথবা পেশা, কেউ ভাড়াটিয়া লেখক হন অথবা ক্রীতকলম, যদি আপনি মুসলিম হন, তাহলে আমাদের এই নসীহত গ্রহণ করুন, পরকালে মুক্তি পাবেন।

وما من كاتب إلا سيفنى ... ويبقى الدهر ما كتبت يداه

فلا تكتب بكفك غير شيء ... يسرك في القيامة أن تراه

অর্থাৎ, প্রত্যেক লেখকই এ দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কিন্তু যুগ যুগ ধরে থেকে যাবে তা, যা তার হস্ত লিপিবদ্ধ করেছে। সুতরাং তুমি তোমার হস্ত দ্বারা এমন জিনিস ছাড়া অন্য কিছু লিপিবদ্ধ করবে না, যা দর্শন করে কিয়ামতে আনন্দবোধ করতে পার।

আর যদি অল্প বিদ্যার লেখক হন, অথবা ধার করা বুদ্ধির লেখক হন অথবা অনুবাদ পড়ুয়া লেখক হন এবং বলেন, 'অনুবাদ ভুল হলে সেই অনুযায়ী আমার ভুল' *(তত্ত্ব.....৫পৃঃ)*---তাহলে বলব, আপনার লেখার কী প্রয়োজন? মুসলিমরা কি আপনার ঐ লেখার মুখাপেক্ষী? ইমাম যাহাবী এই শ্রেণীর লেখককে সম্বোধন ক'রে বলেন,

دع عنك الكتابة لست منها ... ولو سودت وجهك بالمداد

অর্থাৎ, বর্জন কর লেখালেখি করা, তুমি তার যোগ্য নও। বরং তার চেয়ে কালি দিয়ে তুমি নিজ চেহারা কালো কর, (সেটাই ভাল)। *(তাযকিরাতুল হুফ্ফায ১/৪)*

মা আয়েশা (রাঃ) আল্লাহর রসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'মহিলাদের দায়িত্বে কি জিহাদ আছে?' জওয়াবে তিনি বলেছিলেন, "তাদের দায়িত্বে এমন জিহাদ আছে, যাতে কোন প্রকার মারকাট নেই; হজ্জ ও উমরাহ।" *(ইবনে মাজাহ, মিশকাত ২৫৩৪নং)* সুতরাং যুক্তিবাদীদের উদ্দেশ্যে আমাদের বক্তব্য হল, যুদ্ধ যদি না জানা থাকে, তাহলে যুদ্ধক্ষেত্রে না নামাই উত্তম। তাতে ইজ্জত বাঁচবে, জান বাঁচবে।

أقول لها إذا جشأت وجاشت ... مكانك تحمدي أو تستريحي

অর্থাৎ, যখনই মহিলা নাচন-কুদন দেখায়, তখনই আমি তাকে বলি, 'স্বস্থানে অবস্থান কর। তাতে তুমি প্রশংসিতা হবে অথবা আরামে থাকবে।'

উদারচিত্ত পাঠক! রাগ করবেন না। এতে আমি নিজেকেও নসীহত করি। কিন্তু আমার লেখা পেশা না হলেও, নেশা বটে। বরং ওয়াজেব না হলে লিখতামই না। বাংলায় দুর্বল হয়েও ওয়াজেব আদায়ে ত্রুটি করি না। আর মনকে বলি, 'নিজের ঘর যদি কাচ-নির্মিত হয়, তাহলে খবরদার অপরকে পাথর ছুঁড়িস না।'

--(সমাপ্ত)--